ইমাম বুখারী

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

ইমাম বুখারী (র)

প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীসশাস্ত্র বিকাশের সুযোগ ঘটেনি। তবে তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) হাদীস মুখস্থ করে রাখেন এবং লেখাসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীকালে তা যে সকল হাদীসবেত্তা ও হাদীস সংকলকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের কারণে "সিহাহ সিত্তাহ"-রূপে ও অন্যান্য শিরোনামে আজ আমাদের পর্যন্ত এসেছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (র) শীর্ষস্থানীয়। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ, কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম ইসমাঈল। তিনি ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী ইমাম বুখারী (র) অতি অল্প বয়স থেকেই হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন এবং মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, মিসর, বসরা, কুফা, হিজাজ প্রভৃতি অঞ্চলের আনাচে-কানাচে পরিভ্রমণ করে অগণিত হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত ৬ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মহানবী (সা)-এর রওজা মোবারকের পাশে ইস্তেখারা করে ৭,৩৯৭টি হাদীসের যে সংকলন প্রণয়ন করেন তাই 'সহীহ বুখারী' নামে খ্যাত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ইমাম বুখারীর জীবন ও কর্মের উপর "ইমাম বুখারী" শীর্ষক পুস্তকটি রচনা করেন। ইতিমধ্যে বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২ বার প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি সুধী পাঠকমহলে এটি আগের মতোই সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মরহুম পিতা অধ্যাপক মাওলানা আবদুল গণী

ও

মরহুমা মাতা সাফুরা খাতুনের

রূহের সওয়াব রিসানীর জন্যে তাঁদের নামের সংগে আমার এই
ইমাম বুখারী (র)-এর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত রইল।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা
আনতাস সামীউল আলীম।

মুখবন্ধ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামের মূল উৎস– কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে এক একটি লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধার করে আসছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে স্বল্প-সঙ্গী পথিক বলা চলে। আমাদের এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ ইসলামের মূল বুনিয়াদ কুরআনুল-করীম ও হাদীসশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। মরহুম মওলানা আকরম খান, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও কাফী প্রমুখ সুধী গবেষণার যে পথপ্রদর্শন করেছিলেন, তা আজ শূন্য বললেই চলে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে সত্য, তবে তার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। আরও ব্যাপক গবেষণা না হলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়ার বাসনা বৃথা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমরা এতদিন ইসলাম ও মুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিনি। মুসলিমদের ইতিহাসই ইসলামের ইতিহাস বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে। অথচ খুলাফায়ে-রাশেদীনের পরে মুসলিম জীবন ইসলাম থেকে কত পৃথক হয়ে পড়েছে। সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস 'উদ্ধার করা এখন আমাদের পক্ষে আশু কর্তব্য, তা' না হলে মুসলিমদের বিকৃত জীবনকে অপর ধর্মাবলম্বী লোকেরা যে ইসলামেরই জীবন্ত রূপ বলে ভুল বুঝবে তার একান্ত সম্ভাবনা ও অবকাশ রয়ে গেছে।

ইসলামের ইতিহাস প্রণয়ন করতে হলে কুরআনুল-করীমের বিভিন্ন সূরার নাযিল হওয়ার ইতিহাস, জনাব রসূল আকরাম (সা)-এর হাদীসের উৎপত্তি ও সংগ্রহ প্রভৃতির ইতিহাস এবং মুহাদ্দিসগণের জীবনকথা যথাযথভাবে প্রণয়ন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সত্যিকার ইসলামপন্থী মানুষের জীবন-সাধনার ধারাকে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া যাঁরা সত্যিকার ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠায় নানা দেশে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবনকথাও প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান সাহেব ইতিপূর্বে ড. হিলালীর Islamic attitude towards non-Muslim নামক ইংরেজী বইখানা বেশ সুন্দরভাবে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এবারে তিনি ইমাম বুখারী (র) নিয়ে পাঠকপাঠিকার

খেদমতে উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁর পরবর্তী পরিবেশন হবে 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'আল-কুরআন প্রসঙ্গে' 'হযরত আবু জর গিফারীর জীবন কথা' ও 'আল্লামা যামাখশারী'। এভাবে আমাদের লুপ্ত রত্নের উদ্ধারে তিনি আত্মনিয়োগ করে আমাদের সমাজের যে খিদমত করেছেন তা' বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমি সর্বান্তকরণে তাঁর পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫

মুহম্মদ আজরফ
অধ্যক্ষ
আবুজর গিফারী মহাবিদ্যালয়
ঢাকা।

লেখকের গুজারিশ

রাসূলে আকরাম (সা) যেমন গোটা মানবজাতির জন্য একটা চিরন্তন, সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়তও ঠিক তেমনি সর্বকালের, সমগ্র মানবতার ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ লাভের একমাত্র নিয়ামক, বিশ্ব মানবের জন্য এক অখণ্ড চূড়ান্ত জীবন-বিধান। সময় ও স্থানের পরিধি বা যুগকালের আবর্তন-বিবর্তন এঁকে কোনদিনই স্পর্শ করতে বা এঁর ত্রি-সীমানায় পদার্পণ করতে পারে না। বিশ্ব নবী (সা)-এর এই শাশ্বত অনুপম আদর্শ জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রেই অনুসরণীয়। তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন যেমন আমাদের জন্য তথা সকল যুগের মানুষের জন্য একটা অক্ষয় আদর্শ এবং অনন্ত কল্যাণ পথের দিশারী, তাঁর কথা, কাজ সমর্থন ও অনুমোদনের সমন্বয়ে গঠিত হাদীস বা সুন্নাহও ঠিক তেমনি এক চির উজ্জ্বল দীপ-শিখা। এর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে ইসলামী জীবন-বিধানের সর্বকালের সুউচ্চ সৌধমালা।

আল্লাহ পাকের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কুরআন মজীদ যেমন অক্ষুণ্ন অটুট ও অপরিবর্তনীয় রূপে সংরক্ষিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বা সুন্নাহও ঠিক অনুরূপভাবে ধ্বংসের হাত থেকে, অবলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে সুরক্ষিত।

এ কথা সত্য যে, ধর্মনীতি তথা পূর্ণাংগ মুসলিম জীবন-বিধান এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সঠিক ও সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য হাদীস শাস্ত্রই হচ্ছে প্রধান বাহন ও অবলম্বন। হাদীসের মূল্য ও গুরুত্ব তাই অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হিসেবে তাই পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। সুতরাং একাধারে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা, রাসূলে করীম (সা)-এর চিরন্তন জীবনাদর্শ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আলেখ্য এবং এক কথায় শরীয়তে মুহাম্মদীর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে এই হাদীস বা সুন্নাহ। বস্তুত হাদীস ছাড়া কুরআনকে সম্যক অনুধাবন করা এবং ইসলামের রূপরেখা সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা একেবারেই কল্পনাতীত। এই হাদীসের মাধ্যমেই আঁ-হযরত (সা)-এর রাষ্ট্রগত, সমাজগত ও ধর্মগত পুতঃপবিত্র জীবনের খুঁটিনাটি ও পুংখানুপুংখ ঘটনাবলী আমাদের সামনে এসে ধরা দেয়। আমরা তখন জানতে পারি ইসলামের সেই প্রাথমিক সোনালি যুগের আদি ইতিহাস, মুসলিম জীবন-বিধানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং কুরআনী

মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকরী পন্থা। সুতরাং কুরআন ইসলামের আলোকস্তম্ভ আর হাদীস তার বিচ্ছুরিত জ্যোতির দিগন্তপ্রসারী প্লাবন। বস্তুত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে হাদীস সম্বন্ধীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান আহরণ এক অমূল্য ও অপরিহার্য সম্পদ।

আগেই বলেছি, হাদীস নবী মুস্তফা (সা)-এর মুখনিঃসৃত উপদেশমূলক অমিয় বাণী, কর্ম এবং এ জাতীয় অন্যের কাজকর্ম ও কথার প্রতি তাঁর সমর্থন; অনুমোদন ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদীস। এই হাদীসের ভাব, বাণী তিনি আল্লাহর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হতেন 'ইল্‌হামে-খাফী' বা 'গাইর মাত্‌লু' ওয়াহির'[১] মাধ্যমে।'

নবুয়ত প্রাপ্তির পর আঁ-হযরত (সা)-এর গোটা জীবনটাকেই আল-কুরআনের আদর্শের মূর্তমান বাস্তব রূপায়ণ বলা চলে। এক কথায় কুরআনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আদেশ-নিষেধকে জীবন্তরূপে তুলে ধরলে যে আকৃতি দাঁড়ায়, সেটাই রসূলুল্লাহ (সা)-এর গোটা জীবন। তাঁর কর্মই ছিল কুরআনের শিক্ষার বাস্তব রূপ। তাই তাঁর প্রতিটি কার্য ও রচনামৃতকে অতি আগ্রহভরে অক্ষরে অক্ষরে পালন ও মুখস্থ করে রেখেছিলেন সেই সোনালি যুগের সাহাবায়ে-কিরাম বা ভক্ত অনুসারিগণ। বস্তুত একটা জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার পথে ইসলামের ভক্ত, অনুরক্ত, অনুসারীরা প্রজ্ঞা ও প্রেরণার মূল উৎস হিসেবে এই হাদীস থেকে যতোটুকু প্রাণরসের সন্ধান পেয়েছিলেন তার তুলনা সত্যিই কোথাও মেলে না। তদানীন্তন কালে সাহাবীদের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যিই একটা অলৌকিক ব্যাপার, একটা ঐতিহাসিক বিস্ময়। তাই পবিত্র হাদীসকেও তাঁরা এই স্মৃতির মণিকোঠায় পরম আদরে সংরক্ষিত রেখেছিলেন ঠিক যেন যক্ষের ধনের মতোই। এ ব্যাপারে তাঁদের স্বভাব-জাত স্মরণশক্তিই ছিল প্রধান সহায়ক। লক্ষ লক্ষ মুসলিম সন্তান হাদীসের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণকে জীবনের মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে এ পথে তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন অকাতরে, অম্লান বদনে। আসল রাবী বা বর্ণনাকারীর মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস শোনার সংকল্প নিয়ে মদীনা থেকে সেই সুদূর দামেশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করার কষ্টকে তাঁরা অম্লান বদনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হওয়ার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবদ্দশায় আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করতেন। তবুও ভুলে যাওয়ার ভয়ে তাঁর পরোক্ষ ইংগিতক্রমে কেউ কেউ তা লিখেও রাখতেন সযত্নে। সত্যিকার অর্থে

১। প্রচ্ছন্ন বা আবৃত্তি বিহীন ঐশী বাণী যা সর্ব সাধারণের অজ্ঞাত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও গ্রন্থবদ্ধকরণের ব্যাপক অভিযান শুরু হয় সকলের ঐক্যবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টায়।

দূর-দূরান্তের দেশ-বিদেশে যিনি যে হাদীস জানতেন তিনি তা নিজের অপরিহার্য পবিত্র দায়িত্ব ও আশু কর্তব্য মনে করে লিপিবদ্ধ অবস্থায় কেন্দ্রস্থলে এনে জমা দিতেন। এভাবে দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনযাত্রা এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বহু অজ্ঞাত হাদীস সাধারণের দৃষ্টিপথে এসে ধরা দেয়। বস্তুত তখনকার দিনে মুসলিম মনীষীদের প্রাণে ধর্মপ্রবণতা ছিল অতি প্রকট। তাই তাঁরা যে কোন একটা অজ্ঞাত নতুন হাদীসের সন্ধানসূত্র ধরে দূর-দূরান্তর ও পথ-প্রান্তরের সমস্ত কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নতুন স্থানে গিয়ে উপনীত হতেন। এভাবে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এত বেশি হাদীস সংগৃহীত হয় যে, হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান-পিপাসুরা নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে বিপুল সংখ্যায় তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের আবাসভূমিকে হাদীস অধ্যয়নের এক একটা নামকরা শিক্ষায়তনে পরিণত করে তোলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি স্থানে হাদীস আলোচনার এক একটি প্রাণকেন্দ্র স্থাপিত হয় আর সে সব কেন্দ্রে অসংখ্য, অগণিত হাদীস অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ব্যক্তি এসে ভিড় জমাতে থাকেন। সেই সংগে সংগৃহীত হতে থাকে এই অনুসন্ধিৎসুদের লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি আর চলতে থাকে তার যাচাই-বাছাই এবং সত্যতা প্রমাণের কার্যক্রম।

সাধক শ্রেষ্ঠ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের (মৃঃ ১০১ হিজরী ২৫শে রজব) নির্দেশক্রমে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রবাহ আরও দুর্বার গতিতে তরংগায়িত হয়ে উঠে এবং আবু বকর ইবনে হাযম (মৃঃ ১১৭ হিঃ) ও ইমাম যুহরী (মৃঃ ১২৪ হিঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের জীবনভর অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে হাদীস শাস্ত্রের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তার দুর্জয় সত্তা নিয়ে আজও আমাদের সামনে অবিকৃত অবস্থায় সগৌরবে বিরাজমান। সে যুগে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কিছু কিছু মনগড়া হাদীস রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলো থেকে বিশুদ্ধ হাদীসের ছাঁটাইয়ের প্রাক্কালে মুহাদ্দিসগণ যে একাগ্রতা, অনমনীয়তা ও অবিচল নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তার সামনে এই মনগড়া জাল হাদীসের কৃত্রিম প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে পশ্চিমা পণ্ডিতদের মিথ্যা প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমানও আজ সন্দিহান চিত্তে রাসূল (সা)-এর হাদীসকে ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। কিন্তু মুসলিম মনীষীদের

তো কথাই নেই, অমুসলিম পাশ্চাত্য মনীষীরাও এ উৎসকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে সেই হাদীস বিরোধীদের দাঁত ভাংগা জওয়াব দিয়েছেন।

তাই সংগতভাবে আশা করা যায়, আজকের দিনে মানুষের মানস ক্ষেত্রের দ্বিধা-সংশয়, সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে এ জাতীয় হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থমালা অন্তত একটা ক্ষুদ্র আলোকবর্তিকার কাজ করবে সন্দেহ নেই।

নবী মুস্তফা (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহর একনিষ্ঠ সাধক, সেবক ও সংগ্রাহক-সংকলক হিসেবে এই মুহাদ্দিসগণ বিশ্ব-মুসলিম জাহানেরও যথার্থ মঙ্গল ও অনন্ত কল্যাণ সাধন করে গোটা মুসলিম জাতিকে এক অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা সাধারণ্যের লোভ-লালসা, মোহ ও ভোগ লিপ্সার ঊর্ধ্বে থেকে বিরোধী দলের শত অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে স্বীয় চরিত্রবল ও আদর্শ দ্বারা বিশ্ব মুসলিমের স্মৃতিপটে অক্ষয় রেখা অংকন করতে সমর্থ হন।

সকল যুগে এমন কি এই বস্তুশাসিত, দর্শন ও সংশয়ের যুগেও দুনিয়ার মানুষ এই কালজয়ী মহাপুরুষ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হৃদয়, মানস এবং জীবনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা, শিক্ষা ও সান্ত্বনার পাথেয় খুঁজে পেয়েছে। এর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে এঁদের মহত্ত্বের বাস্তব দিকের প্রতি মানুষের শুভদৃষ্টি আপনিই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এহেন কীর্তিমান সাধক পুরুষগণের পুতঃজীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে কার না ইচ্ছা হয়!

আরবী, ফার্সী, উর্দুতে এই পুণ্যশ্লোক মুহাদ্দিসগণের বহু গবেষণামূলক জীবনকাহিনী সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এ প্রসঙ্গে ভয়াবহ দীনতা ও শূন্যতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

কতকটা সুধী পাঠকবর্গের এই দুর্বার প্রচ্ছন্ন চাহিদা পূরণ আর কতকটা বাংলা ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের অপ্রতুলতা বিদূরণ ও অভাব মোচনের অভিপ্রায় নিয়ে আমি নিজের স্বল্প বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অন্যান্য অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে এই দুর্গম-বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। আমার এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গত বিচার-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল্যায়ন চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ পাঠকরাই করবেন। মানদণ্ড ও কষ্টি পাথর তো তাঁদের হাতেই।

আমার এ লেখাগুলো বেশ কিছুদিন আগে ঢাকার সাপ্তাহিক 'আরাফাত' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'নেদায়ে ইসলামের' পৃষ্ঠাসমূহে বের হয়। তখন এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশের কোন পরিকল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু পরে বন্ধু-

বান্ধব, শিষ্য-শাগরিদ ও শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের পরামর্শই আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন গতবারে দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে আমার এক প্রবাসী বন্ধু কলকাতার জনৈক প্রকাশক। আমার দুর্ভাগ্য যে, তাঁর হাতে তখন আমি পাণ্ডুলিপিটা অর্পণ করতে পারিনি। আজ বহুদিন পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম সাহেবের প্রেরণা ও সৌজন্যে বহির্জগতের আলো-বাতাসের সংগে একে পরিচিত করতে পেরে তাঁর কাছে আমার নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অবশ্য ইতিপূর্বে 'মুহাদ্দিস প্রসংগে' নাম দিয়েও একত্রে প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে।

নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষিতে পুস্তিকাখানি নিখুঁত ও সর্বাংগসুন্দরভাবে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে না পারায় আমি মর্মে মর্মে পীড়া অনুভব করছি। তবুও যদি সুধী পাঠক-পাঠিকা এ থেকে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে এবং আরো কতকগুলো অপরিহার্য কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের আলোচনা এবারের মত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছি। আগামী দিনে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলোর যথাযোগ্য সংযোজন, পরিবেশন এবং অন্যান্য ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের বাসনা অন্তরে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রইলাম। সহৃদয় ও আগ্রহী পাঠকবৃন্দের খিদমতের সনির্বন্ধ নিবেদন, যেন তাঁরা আগামীতে এই ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে এবং বিষয়বস্তু, অংগসজ্জা, রচনাশৈলী উপস্থাপনা ও অন্যান্য উন্নতিকল্পে যে কোন কার্যকরী প্রস্তাব ও পরামর্শ দিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ না করেন। নিঃসন্দেহে তাঁদের এ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে এবং আমি আজীবন পরম কৃতজ্ঞতার সাথে এ ঋণের কথা স্মরণ করবো।

'সিহাহসিত্তাহ' এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের জীবনীর পরিসমাপ্তি এখানেই নয়। এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে শুধু প্রথিতযশা কালজয়ী হাদীসবেত্তা ইমাম বুখারী (র)-এর কথা। অনুরূপভাবে 'সিহাহসিত্তার' বাকি পাঁচজন হাদীসবিদ এবং অবশিষ্টদের আলোচনাসহ আলাদাভাবে পুস্তক রচনার ইচ্ছে রইল অনাগত দিনে। বিষয়বস্তু যে অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী তা বলাই বাহুল্য। তাই শুভানুধ্যায়ী সুযোগ্য পাঠকবর্গের কাছ থেকে এই আরব্ধ কার্যের আশু পরিসমাপ্তির ব্যাপারে আমি ঐকান্তিক দোয়ার প্রত্যাশী।

পুস্তিকাটিকে অর্গলাবদ্ধ পাণ্ডুলিপি থেকে বহির্জগতের মুক্ত আলো-বাতাসে নিয়ে আসার ব্যাপারে যাঁরা নানা দিক দিয়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য-সহায়তা করেছেন,

উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, ঘটা করে আলাদা আলাদাভাবে সবার নাম উল্লেখ করে আজ আমি তাঁদের মর্যাদাকে খর্ব করতে আর অযথা ঋণের বোঝা বাড়াতে চাইনে। চাই শুধু অলক্ষ্যে থেকে নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে, দোয়া করতে এবং আন্তরিক শুকরিয়া ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করতে।

এ গ্রন্থ প্রণয়ণে যে সব মনীষীর পুস্তকাবলী থেকে আমি তথ্য আহরণ করেছি–এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞতার জালে জড়িত। তথ্যের ব্যাপারে কিংবা অন্য কোন মুদ্রণ ত্রুটি থাকলে তা নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত উদার মনোবৃত্তি ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য।

অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হবে যদি আমি এ প্রসংগে আরও দুজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও কর্তব্যবোধের কথা স্মরণ না করি। এঁরা আমার স্ত্রী মিসেস বিলকিস্ বেগম ও আমার পুত্র মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীক্। এরা ত্যাগ স্বীকার না করলে নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থের প্রকাশনাকার্য আরও বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হতো।

এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের সূচনায় আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও সুপণ্ডিত ঢাকা আবুজর গিফারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ সাহেবের মূল্যবান মুখবন্ধ বহুল পরিমাণে এর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সুষ্ঠু মুদ্রণের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বেশ ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ম-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মদীনা প্রিন্টার্সের মালিক প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিক বন্ধুবর জনাব আলহাজ্জ মওলানা মুহিউদ্দীন খান ও তাঁর অধীনস্থ কর্মীবৃন্দ। এঁদের কাছেও আমি কম ঋণী নই। তাই এঁদের উদ্দেশ্যেও জ্ঞাপন করি অজস্র শুকরিয়া।

সর্বশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার সবিনয় নিবেদন, যেন তিনি দয়াপরবশ হয়ে এই অকিঞ্চিৎকর খিদমতটিকে কবুল করেন এবং পারলৌকিক মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন! আ-মীন !!

মির্যাপুর বিনোদপুর
পোঃ কাজলা, রাজশাহী
২০শে সেপ্টেম্বর,১৯৭৯

দীন সেবক
মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
এম,এ,(রাজশাহী),এম,এম,ঢাকা,
এম,ও,এল,(লাহোর)
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমাম বুখারী (র)

হাদীস শাস্ত্রে বিশ্ব-সম্রাট উপাধিতে ভূষিত ইমাম বুখারী (র)-এর আসল নাম ছিল মুহাম্মদ। কুনিয়াতের দিক দিয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন আবু আবদুল্লাহ্ নামে। তাঁর পিতার নাম ছিল ইসমাইল। তিনি ৪র্থ তাব্কার নামকরা হাদীসবেত্তা ছিলেন। দাদার নাম ইব্রাহীম ও পরদাদার নাম ছিল মুগীরা-বিন-বারদেয্বা। ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল, শুক্রবার জুম্আর নামাযের বাদ তিনি বুখারা শহরে ভূমিষ্ঠ হন।

বুখারা শহর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত উজবেকিস্তানে অবস্থিত। এককালে এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। মুসলিম শাসনাধীনে আসার আগে এটি সামানিয়া রাজাদের রাজধানী ছিল।

ইমাম বুখারীর পরদাদা বা প্রপিতামহ মুগীরা বুখারার তদানীন্তন শাসনকর্তা ইয়ামান জা'ফীর কাছে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বুখারায় অবস্থান করতে থাকেন। এজন্যেই এই বংশকে জা'ফী বংশ বলা হয়। কারণ তখনকার দিনে ইয়ামানে কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে জা'ফী তাঁকে নিজ বংশ পরিচয়ে আশ্রয় দিতেন।

তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। পরদাদা মুগীরা পারস্য হতে খোরাসানের অন্তর্গত বুখারা নামক শহরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি স্বীয় মাতার নিকটই প্রতিপালিত হন। আহমদ নামে তাঁর এক বড় ভাই ছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁর পিতাও একজন নামকরা মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম মালেক, হাম্মাদ এবং উবনুল মুবারক প্রমুখ বিশিষ্ট হাদীসবেত্তার প্রিয় শিষ্য হিসাবে বহুদিন ধরে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম বুখারী স্বয়ং তাঁর 'তারীখে-কবীর' নামক গ্রন্থে স্বীয় পিতার বিস্তৃত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বীয় পিতার জ্ঞান-গরিমা ও অন্যান্য মনীষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যথারীতি গৌরব প্রকাশ করেন। যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম সন্তানই বটে।'[১]

বাল্যকাল হতেই ইমাম বুখারী (র)-এর উপর আল্লাহ্র বিশেষ রহমতের দৃষ্টির নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল। ইমাম বুখারী বাল্যাবস্থায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মাতা ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশায় সর্বদাই কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্ তাঁর মাতার দোআ কবুল করেন, ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে

---

১. 'সীরাতুল-বুখারী' 'আনওয়ারুল-মাসাবীহ্' বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন।

পান। কথিত আছে যে, এই স্নেহময়ী মাতা স্বপ্নযোগে নবী ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-কে দেখতে পেয়েছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ) স্বপ্নে তাঁর মাতাকে সম্বোধন করে বললেন– "হে উম্মে-মোহাম্মদ! তুমি শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। তোমার শিশুপুত্র দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ার কারণে যেহেতু তুমি মনে-প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছ ; তাই তোমার কাতর কণ্ঠের রোদন ও বিলাপধ্বনি শুনে আল্লাহ্ পাক দয়া পরবশ হয়েছেন এবং তোমার প্রাণাধিক পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" আল্লাহ্র কী অপার মহিমা! এই স্নেহময়ী মা অতি সকালে শয্যাত্যাগ করে ওযু-নামাযের পর যখন ছেলের চোখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তখন দেখতে পেলেন সত্যি সত্যিই ছেলের চক্ষু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছে। এই অভাবিতপূর্ব দৃশ্যে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। আনন্দ গদ্গদ্ চিত্তে তিনি আল্লাহ্র সমীপে অজস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।[১]

দৃষ্টিশক্তি লাভের পর তাঁর চক্ষের জ্যোতি এত তীক্ষ্ণ হয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে চাঁদের আলোতে তিনি লেখাপড়ার কাজ অনায়াসে সমাধা করতে পারতেন। তাঁর সংকলিত "আততারিখুল-কবীর" নামক বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি চাঁদের নির্মল আলোকেই লিখে শেষ করেন। ইমাম বুখারীর এই হস্তলিখিত অমূল্য গ্রন্থখানি ভারতের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক্ আযিমাবাদীর (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ; ১৯১১ খৃঃ) ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

পিতার অকাল মৃত্যুতে শিশু পুত্রের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বভার তাঁর পুণ্যাত্মা জননীর উপর ন্যস্ত হলো। মুহাম্মদ-বিন-ইসমাইল বুখারী (র) মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে তাঁরই উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন এই প্রতিভাসমুজ্জ্বল বালক অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পবিত্র হাদীস শাস্ত্র ও ইসলাম সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই হাদীস শাস্ত্রের পবিত্র শিক্ষার ব্যাপক অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি সিরিয়া, মিসর, আলজাযায়ির, বস্রা, কুফা, হিজায প্রভৃতি দেশ-বিদেশের আনাচে-কানাচে অনন্যমনে পরিভ্রমণ করতে থাকেন।

এ সময় থেকে তিনি অন্তরে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অনুভব করেন এবং সনদসহ হাদীস কণ্ঠস্থ করতে অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়ে সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেন। মুহাম্মদ-ইবনে-আবি হাতিম বররাক বলেন, "আমি

১. সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী কৃত 'হায়াতে ইমাম-বুখারা'।

বুখারীকে বলতে শুনেছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই আমি হাদীস কণ্ঠস্থ করার প্রেরণা পাই।" আরও বলেন, "আমি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করে অবগত হই যে, তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখনই তাঁর কণ্ঠস্থ করার স্পৃহা বলবতী হয়েছিল।[১] এ সময়ে তিনি অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস চর্চা আরম্ভ করেন।" হাদীস শিক্ষার সূচনাতেই এ বিদ্যায় তিনি যে অপূর্ব পারদর্শিতার পরিচয় দেন তার একটি নযীর পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করছি।

বুখারা নগরীতে এ সময় খ্যাতনামা মুহাদ্দিস আল্লামা দাখেলী অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাগারটি যেমন জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, তেমনি তার যশ ও প্রভাব চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। একদিন তিনি যখন তাঁর ছাত্রমণ্ডলীকে পাঠ দিচ্ছিলেন, সে সময় ইমাম বুখারী হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন এবং দরসে যোগদান করেন। আল্লামা দাখেলী একটি হাদীসের সনদ এভাবে বর্ণনা করেন—"সুফিয়ান আবু জুবায়ের হতে, তিনি ইব্রাহিম হতে রেওয়ায়েত করেছেন।" সঙ্গে সঙ্গে ইমাম বুখারী প্রতিবাদ করে বলেন–"আবু জুবায়ের ইব্রাহিম হতে রেওয়ায়েত করেননি।" একটি অপরিচিত ও অল্পবয়স্ক বালকের এইরূপ প্রতিবাদে আল্লামা দাখেলী বিচলিত ও চমকিত হয়ে উঠেন ও রুক্ষভাবে দু'-চারটি শক্ত কথা শুনিয়ে দেন। কিন্তু বালক বুখারী কখনো দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অতি বিনম্র বচনে আরয করলেন ঃ "মহাত্মন! যদি আপনার নিকট আসল বর্ণনালিপি (মুসাবিদা) থাকে তা'হলে মেহেরবাণী করে আপনি তা দেখুন।" আল্লামা দাখেলী তৎক্ষণাৎ গৃহে গিয়ে আসল বর্ণনালিপি উত্তমরূপে দেখে নিজের ভ্রমের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি ইমাম বুখারীকে উক্ত হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব উত্তর দেন,—"আবু জুবায়ের নয় বরং আদির পুত্র জোবায়ের ইব্রাহিম হতে রেওয়ায়েত করেছেন।" আল্লামা দাখেলী নতশিরে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে নেন। অতঃপর তিনি তখনি তাঁর সম্মুখস্থ কিতাবেও ভুল সংশোধন করে নেন ও বলেন ঃ "বৎস! তুমি যা বলেছ তাই ঠিক, আমিই ভুল করেছিলাম।" এ সময় বালক বুখারীর বয়স মাত্র এগার বছর। এরূপ অল্প বয়সে তিনি কেবল হাদীস সঠিকভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখার ব্যাপারেই যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহীহ ও গায়ের সহীহ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে হাদীসের দোষ-ত্রুটি যাচাই করার দুরূহ কাজেও প্রবল ঔৎসুক্য ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। হাদীসের রাবিগণের পুংখানুপুংখ অবস্থা, তাঁদের সাধুতা ও বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা, স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনা ক্ষমতা, চরিত্র ও ব্যবহারিক জীবন, বাসস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষার

১। মুকাদ্দমা ফাতহুল বারী, ৪৫৮ পৃঃ।

স্থান, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং রাবিগণের পারস্পরিক সাক্ষাৎ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়েও তথ্য অবগত হওয়ার জন্য অন্তরে এক আকুল আগ্রহ ও প্রবল প্রেরণা অনুভব করেন।

ইমাম সাহেবের শিক্ষাযুগের প্রারম্ভকালে বুখারার বিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত প্রতিভাবান ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিস বিরাজমান ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দী, ইউছুফ বয়কন্দী, আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ খুসনদী, ইব্রাহিম ইবনে আল-আশ-আস্। ইমাম সাহেব এ সব মনীষীর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

ইমাম সাহেব ষোল বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় আবাসভূমিতে অবস্থান করে উপরোক্ত হাদীসশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এই অল্প বয়সেই তিনি হাদীস শাস্ত্রে এমন সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, হাদীসের প্রসিদ্ধ মুদাররিসগণও তাঁর উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করতেন। কারণ তাদের মনে এরূপ দ্বিধা ও সংশয় জাগতো যে, কি জানি কখন, কোন্ দুর্বল মুহূর্তে ভ্রান্তি বা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে যায় এবং একটি ছোট বালকের নিকট লজ্জিত হতে হয়।

ইমাম সাহেবের বাল্যকালের একটি ঘটনা আল্লামা সলিম ইবনে মুজাহিদ এভাবে বর্ণনা করেছেন।—"একদিন আমি মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দীর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি বলেন, আর কিছুক্ষণ পূর্বে আসলে এমন এক অদ্ভুত প্রতিভাবান বালকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য ঘটতো যাঁর ৭০ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ আছে।" তাঁর কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম ও উক্ত বালকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর সন্ধানে বাহির হয়ে পরলাম। সৌভাগ্যক্রমে পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বৎস! তুমি নাকি ৭০ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ রাখার দাবি করে থাক?" উত্তরে তিনি বললেন, "জী হ্যাঁ! বরং তা অপেক্ষাও অধিক হাদীস আমার কণ্ঠস্থ আছে। হাদীস মারফু হোক কিংবা মাওকুফ, উহাদের অধিকাংশ রাবীর আবাসভূমি, মৃত্যু সন ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমি বলে দিতে সক্ষম।"[১]

হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদেশে যাবার পূর্বে একদিন মুহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দী ইমাম বুখারীকে বললেন—"বৎস! আমার গ্রন্থসমূহে কোন প্রকার ভ্রম দেখতে পেলে তুমি নিঃসঙ্কোচে উহা সংশোধন করে দাও।" এতে বিস্ময়বোধ করে এক ব্যক্তি

১. মুকাদ্দমা–ই-কাসতালানী ঃ ৩৩ পৃঃ।

বয়কন্দীকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাত্মন ! এ নওজোয়ানটি কে ?" আল্লামা বয়কন্দী উত্তর করলেন,–"ইনি এমন ব্যক্তি যার সমকক্ষ কেউ নেই।"[১]

"হাযাল্লাযী লায়সা মেছলহু"

মনে রাখা দরকার উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য মহাত্মা ইমাম বুখারী জন্মভূমির নাগপাশ কাটিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিভ্রমণের পূর্বেই মুহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দী তাঁর সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। দেশ পর্যটন এবং শিক্ষা-দীক্ষা সমাপনান্তে পুনরায় মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনের পর ইমাম বুখারীর সঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে সালাম বয়কন্দীর আর কোন দিন সাক্ষাৎ ঘটেনি।[২]

পবিত্র হারামাইন (মক্কা ও মদীনা) ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ও মুসলিমগণের পুণ্য ভূমি হলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী এবং তার আচরিত জীবনাদর্শমূলক সমুদয় হাদীস এ দু'স্থানে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবেঈন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। সুতরাং যাবতীয় হাদীস সংগ্রহের জন্যে অনুসন্ধিৎসু হাদীসবিদগণের পক্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তর অংশে পর্যটন ভিন্ন উপায় ছিল না। মুহাদ্দিসগণকে এজন্যে কঠোর সাধনা ও দুঃসহ পরিশ্রম স্বীকার করতে হতো। ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহের জন্য যেরূপ কঠোর নীতি অনুসরণ করে চলতেন তজ্জন্য তাঁর কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কঠোরতম সাধনায় সাফল্য অর্জনের জন্য যে অদম্য সাহস, অবিচল ধৈর্য ও অটল সংকল্পের প্রয়োজন, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁকে তা পূর্ণভাবেই দান করেছিলেন।

বিদেশ পর্যটনে ইমাম বুখারীকে বিপদের উপর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনও আহার্যের অভাবে লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করেছেন, কখনও তিনি স্বীয় বিপুল ধন-সম্পদের শেষ কপর্দক এ মহান কাজে ব্যয় করে দিয়ে রিক্ত ও নিঃস্ব সাজতে আদৌ কুণ্ঠিত হননি। উপবাসে দিন কাটিয়েছেন তিনি; কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। বরং সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির আকুল বাসনায় অন্তরে অদম্য স্পৃহাকে সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা করেছেন। সওয়ারীর অভাবে পথে-প্রান্তরে তাঁর পদযুগল ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে, তবু তিনি মুহূর্তের জন্যও অস্বস্তি বোধ করেননি। কঠিন হতে কঠিনতর অবস্থায় পড়েও ধৈর্য হারাননি। এরূপ সাধনা ও

১. হাদউসসারী মুকাদ্দমা-ই-ফাতহুল বারী ঃ ৪৮৪ পৃঃ।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ কৃত কালেমাতে তাইয়েবাত এবং মুকাদ্দমা-ই-ফাতহুল বারী ঃ ৪৮৪ পৃঃ।

ত্যাগের পথে তিনি ইমামুল-মুহাদ্দিসীন বা 'মুহাদ্দিসকুল গৌরব' আখ্যায়ও আখ্যায়িত হওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত রুটির সঙ্গে তিনি কোন তরকারি ব্যবহার করেননি। কোন কোন সময় মাত্র দু'-তিনটি বাদাম গলাধঃকরণ করেই ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হয়েছিল গরীব ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-পথ সুগমকরণের জন্য। তিনি শান-শওকত ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন কোনদিনই পছন্দ করতেন না।[১]

ইবনে আবি হাতেম আররাকের বর্ণনানুযায়ী—ইমাম বুখারী শিক্ষা লাভের জন্য সর্ব প্রথম ২১০ হিজরীতে বিদেশে যাত্রা শুরু করেন। ইমাম সাহেব ২১০ হিজরীতে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তদীয় পুণ্যবতী জননী ও জ্যেষ্ঠ সহোদর আহমদের সাথে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মোয়াজ্জমায় পদার্পণ করেন। মাতা ও ভ্রাতা হজ্জ ক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন; কিন্তু ইমাম সাহেব মক্কার পবিত্র ভূমিতে কিছুকাল অবস্থানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। সুতরাং তাঁকে সেখানেই রেখে তার মাতা ও ভ্রাতা বিরহ-বিধুর অন্তরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পবিত্র স্থানে হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনায় মনোনিবেশের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথিতযশা শিক্ষকগণের খেদমতে হাজির হন। উক্ত সময়ে যে সব যশস্বী মনীষী হাদীস শাস্ত্রবিদরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন—তন্মধ্যে ইমাম আবুল ওয়ালীদ, আহমদ ইবনে আল-আরজকী, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ, ইসমাইল ইবনে সালিম আস্ সায়েগ, আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এবং আল্লামা হোমাইদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম সাহেব এঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ ছাড়াও মক্কা মোয়াজ্জমায় অবস্থানরত অন্যান্য বহু শায়েখের নিকট হতে কমবেশি কিছু না কিছু শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।

এভাবে মক্কা নগরীতে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর ২১২ হিজরীতে ১৮ বছর বয়সে ইমাম সাহেব মদীনাভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সে সময় মদীনা শরীফে শিক্ষাদানকার্যে যাঁরা ব্রতী ছিলেন তন্মধ্যে ইব্রাহিম ইবনে আল-মনজর, মোতরফ ইবনে আবদুল্লাহ, ইব্রাহীম হামজা, আবু সাবেত মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ, আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওয়াইসি প্রমুখ মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মদীনা শরীফের এ সফরেই ইমাম সাহেব 'তারিখে-কবীর' নামক সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থখানার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি চন্দ্রালোকে লিখে সমাপ্ত

১. হাজী খলীফা কৃত "কাশফুয-যুনুন" এবং ইমাম যাহবী কৃত "হায়াতে ইমাম বুখারী।"

করেন। শিক্ষালাভের জন্য ইমাম সাহেব মিসর, খোরাসান, ইরাক, হিজায ও বাগদাদ ইত্যাদি শহরের মুহাদ্দিসগণের নিকটও গিয়েছিলেন।

হাদীস বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীসের শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য ইমাম বুখারী একাধারে ছয় বছর কাল ধরে মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও জেদ্দা শহরে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তবে ইহা একই সফরের মধ্যে সীমিত ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি হিজায থেকে যখন বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন বসরা নগরী হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। ইমাম সাহেব এখানে আগমন করে তৎকালীন বহু প্রখ্যাতনামা হাদীসবেত্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এভাবে তিনি হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেন।

বসরার সুধীমণ্ডলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কুফাভিমুখে যাত্রা করেন। কুফা নগরীর যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন, তাঁদের নামের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ইমাম নববী স্বীয় 'তাহযীবুল-আসমা' নামক গ্রন্থে। অনুরূপভাবে তিনি সিরিয়া, বল্খ, হিরাত, মার্ভ, রাই, জাযিরা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হয়ে সে যুগের স্বনামধন্য বিদ্বানমণ্ডলীর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অবশ্য এই শেষোক্ত শহর অর্থাৎ জাযিরা অভিমুখে ইমাম সাহেবের যাত্রার কথা আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী 'তাবকাতে কুবরা' নামক গ্রন্থে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকীর এই উক্তি ইমাম নববী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ) এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানীর (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) তত্ত্বানুসন্ধানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আব্বাসীয় খলীফাদের রাজত্বকালে মুসলিম জাহানের রাজধানী মহানগরী বাগদাদ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখা ও শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুসলিম জগতের প্রতিটি কেন্দ্র ও প্রান্ত থেকে স্বনামখ্যাত বিদ্বানমণ্ডলী জ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের জন্য এখানে এসেই একত্রিত হতেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে এবং মনীষী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করতে হলে এখানে আসা বিদ্বানমণ্ডলীর জন্য ছিল অপরিহার্য। জ্ঞান-পিপাসু ইমাম বুখারীও তাই তাঁর অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য একাধিকবার বাগদাদ নগরীতে উপনীত হয়েছিলেন। বাগদাদের সমসাময়িক খ্যাতনামা বিদ্বানমণ্ডলীর সুদীর্ঘ সূচীতে ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বলের (মৃঃ ২৪১ হি ; ৮৫৭ খৃঃ) নাম বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। ইমাম বুখারী যখন শেষবারের মত বাগদাদের বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বলের সঙ্গে দেখা করতে যান। ইমাম আহমদ (র) তাঁর বিদায় সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং

অনুতাপ ও অনুযোগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন–"আপনি কি তাহলে এখানকার জ্ঞানী-গুণী-মহাজন ও সমসাময়িক মনীষীবৃন্দের সাহচর্য ছেড়ে খোরাসান অভিমুখেই যাত্রা করছেন ?"

ইমাম বুখারীর অন্তকরণে তখন ইমাম আহমদের এই প্রশ্ন কিরূপ আবেগ মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা' বলতে পারি না। তবে তাঁর জীবন সায়াহ্নের সেই করুণ মর্মন্তুদ মুহূর্তে বার বার এই বিদায়-বাণী তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হয়েছিল–যখন বুখারার কুখ্যাত শাসনকর্তা মিথ্যা অপবাদের দায়ে তাঁকে শোচনীয়ভাবে দেশান্তরিত করার গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছিলেন।[১]

শিক্ষা সমাপ্তির পর হাদীস সংকলনের যুগ আসলে তিনি সেই মহান কাজে লিপ্ত হন এবং তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অমৃতময় ফলস্বরূপ প্রায় ৬ লক্ষ হাদীসের মধ্য হতে নির্বাচন করতে করতে মাত্র সাত সহস্রাধিক হাদীস চয়নপূর্বক সহীহ বুখারীর মত বিশ্বস্ততম হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এবিষয়ে পূর্ববর্তী কারও সাথে তাঁর তুলনা হয় না।

ইমাম সাহেব কোন্ সময়ে, কি পরিবেশে এবং কত দিনে সহীহ বুখারীর সংকলন কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন এবং সংকলনের পর কোন্ কোন্ খ্যাতনামা উলামার খিদমতে উহা উপস্থাপন করেছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়। বররাক এ সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম সাহেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উহাতে তিনি বলেছেন, "আমি সুদীর্ঘ ষোল বছর সহীহ বুখারী সংকলন করেছি।" তিনি একথাও বলেছেন, "আমি জামেউস-সহীহ তিনবার লিপিবদ্ধ করেছি।" আবুল হায়সাম কাশমিহিনী বলেছেন, "আমি ইমাম ফিরাবরী হতে শুনেছি, তিনি বলতেন "আমি যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল করে দু'রাকায়াত নামায আদায় না করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন হাদীস আল জামেউস সহীহ-এর ভিতর দাখেল করিনি।"[১]

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি উহা মসজিদে হরমে বায়তুল্লাহ শরীফে বসে সংকলন করেছি। দু'রাকাত নামায পড়ার পর প্রত্যেক হাদীসের উপর ইস্তেখারা করেছি, যখন আমি সকল দিক দিয়ে উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি তখনই হাদীসটি আল-জামেউস সহীহ-এর মধ্যে সন্নিবেশিত করে নিয়েছি এবং এ গ্রন্থ সংকলনের সময় ছয় লক্ষ হাদীস থেকে শুধু সহীহ ও বিশ্বস্ততম হাদীসগুলোই নির্বাচন করে লিপিবদ্ধ করেছি।[২]

---

১. তাহজিবুত্তাহাজিব (৯) পৃঃ ৪৯।
২. মোল্লা আলী কারী কৃত "মিরকাত" ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩।

নিখিল দুনিয়ার মুসলিম সমাজ যে সমস্ত কারণে ইমাম বুখারী (র)-কে 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন ও আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' আখ্যায় ভূষিত করেছেন তন্মধ্যে এই মহাগ্রন্থখানিই তার মুখ্য কারণ।

আজ সমগ্র মুসলিম-জগতে মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের পরই সহীহ বুখারীর স্থান। নিখিল দুনিয়ার মুসলিম সমাজ এঁর সামনে মাথা হেঁট করতে বাধ্য। মুহাদ্দিস ইবনে খুযাইমা সত্যিই বলেছেন– "ইমাম বুখারীর মতো এত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাদীসের হাফেজ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। সত্যিই তিনি ছিলেন দুনিয়াতে আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ।

ইমাম বুখারী (র) একদিন তাঁর ওস্তাদ ইমাম ইসহাক-বিন-রাহওয়াই (মৃঃ ২৩৮ হিঃ)-এর হাদীস শিক্ষার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওস্তাদ একদিন অনুযোগের স্বরে বললেন–"হায়! যদি কেউ রাসূলুল্লাহর শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলোকে একত্র করে সংকলন করত তাহলে জাতির পক্ষে একটা বিরাট উপকার সাধিত হতো।" সহীহ হাদীসের এই তীব্র ও উৎকট অভাব ইমাম বুখারী মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট রয়েছেন আর ইমাম বুখারী তাঁর গায়ে বিরাট বড় পাখা ঘুরিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলেন ঃ ইমাম বুখারী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসসমূহ থেকে সকল মিথ্যার জাল অপসারিত করবেন। অতঃপর তিনি তাঁর এই 'জামেউস সহীহ' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। পুণ্যভূমি মক্কার হেরেম শরীফে বসে তিনি এর 'মুসাবিদা' বা পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং মদীনা তাইয়েবার মসজিদে নববীতে বসে তিনি এর চূড়ান্ত রূপ দান করেন।

ইমাম বুখারী (র) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে তাকরার বা পুনরাবৃত্তিসহ ৭৩৯৭টি এবং তাকরার বাদ দিয়ে মাত্র ২৭৬১টি হাদীসকে তাঁর এই সহীহ বুখারীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন।[১]

আজ সমগ্র মুসলিম-জাহানের এমন কোন স্থান নেই যেখানে সহীহ বুখারীর শিক্ষা দেওয়া হয় না। নিখিল দুনিয়ার প্রতিটি ইসলামী শিক্ষায়তনেই এই বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমামুল-মুহাদ্দিসীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার কথা শ্রবণ করে দেশ-বিদেশের লোক তাঁকে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। যখন তিনি কোন শহরে শুভাগমন করতেন তখন তাঁর চেহারা

১। Hadith Literature by Dr. M.Z. Siddiqi, pp. 89-96

মুবারক দর্শনের জন্য চতুর্দিক হতে এত লোকের সমাগম হতো যে তাঁর উপস্থিতির স্থানে তিল ধারণের জায়গা অবশিষ্ট থাকত না। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য এবং অন্তত একবার তাঁর কাছে তাঁর কিতাব 'জামেউস সহীহ' পড়ার জন্য সবাই অন্তর থেকে আকুল আগ্রহ প্রকাশ করত। কথিত আছে, ৯০ হাজার লোক তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই 'জামেউস সহীহ' অধ্যয়ন করেছেন।

শিক্ষা সমাপন করে তিনি স্বীয় জন্মভূমি বুখারায় ফিরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ যখন তাঁর আগমনবার্তা শুনতে পায় তখন শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁর শুভাগমন প্রতীক্ষায় নির্নিমেষ চেয়ে থাকে। তাঁর সাদর সংবর্ধনার্থে শহরের বহির্দেশে তিন মাইল পর্যন্ত শামিয়ানা ও অসংখ্য তাঁবু খাটান হয়। নগর প্রান্তে উপনীত হলে নগরবাসীরা অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমক সহকারে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। অতঃপর তাঁকে তারা মহাসমারোহে শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে একটি প্রীতিভোজের দ্বারা আপ্যায়িত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মঙ্গল কামনায় দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে পরিতৃপ্ত করার জন্য বহু অর্থ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

পরে ইমাম সাহেব যখন অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন তখন অচিরেই তাঁর সুষ্ঠু ও সার্থক শিক্ষাদানের কথা আশেপাশের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তাই হাদীস শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য দলে দলে লোক তাঁর শিক্ষাগারে ভিড় জমাতে থাকে। সমগ্র মুসলিম জাহানের এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকগণ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষাগারে উপনীত হয়ে শিক্ষালাভ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যে সমস্ত প্রখ্যাত ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষতার দাবি করতেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হতেন, তাঁরাও অবশেষে তাঁর অগাধ জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্বতায় মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে আগ্রহ সহকারে তাঁর শিক্ষাগারে যাতায়াত শুরু করেন। রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং তারীখ ও হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গও ইমাম বুখারীর দারস্গাহে হাজির হয়ে তাঁর ফতওয়া ও তাকরীরসমূহ লিপিবদ্ধ করে নিতেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবর্গ ও ছাত্র মুহাদ্দিসদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করে ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকরা আলাদা আলাদা ভাবে পুস্তক-পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। (আল্লামা আবু আলী গাযালী কৃত 'তাকঈদুল মুহ্মাল' ও 'তাবাকাতে কুবরা', পৃঃ ৩২, 'মুকাদ্দমাই-কাসতালানী'–পৃঃ ৬২)।

হাশেদ ইবনে ইসমাইল বর্ণনা করেছেন, "ইমাম বুখারী বসরার মুহাদ্দিসগণের শিক্ষাগারে আমাদের সহিত যোগদান করতেন। কিন্তু কোনদিন কিছুই তিনি লিখে নিতেন না। এভাবে কিছুদিন গত হলে আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, "আপনি কিছুই লিখে রাখেন না, এভাবে শুধু অনর্থক সময় নষ্ট করছেন আপনি।" কয়েকদিন এভাবে আমাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে একদিন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমার প্রতি অবিচার করে আপনারা সীমা অতিক্রম করে চলেছেন। আচ্ছা, বেশ কথা, এতদিন পর্যন্ত আপনারা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা আমার নিকট পাঠ করুন।" তখন একে একে আমরা সকলেই আপন আপন লিখিত বস্তুগুলি বের করে পড়তে শুরু করলাম। আশ্চর্যের বিষয়, যখন আমাদের সকলের পাঠ শেষ হলো তখন ইমাম সাহেব আমাদের পঠিত অংশগুলি সমস্তই মুখস্থ আবৃত্তি করে আদ্যোপান্ত শুনিয়ে দিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও ১৫ সহস্র হাদীস আমাদেরকে শুনালেন্ন তিনি। এমন কি আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ লিখিত হাদীসগুলির ভ্রান্তিসমূহ তাঁর বিশুদ্ধ মৌখিক পাঠ হতে সংশোধন করে নিলাম। আগেই বলেছি, সে সময় ইসলাম জগতের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানী বাগদাদ নগরী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং তথায় বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ অবস্থান করতেন। এহেন বাগদাদ নগরীতে ইমাম বুখারী যখন পদার্পণ করলেন সে সময় তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা ইসলাম-জগতের চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তাঁর এ জগৎজোড়া খ্যাতির সত্যাসত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তদানীন্তন বাগদাদ নগরীর মুহাদ্দিসগণের প্রবল ইচ্ছা জন্মিত। তাঁরা ইমাম সাহেবের স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরীক্ষার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

স্থির হলো, একশ হাদীস নির্বাচনপূর্বক এক একটি হাদীসের সনদকে অপর হাদীসের মতনের সাথে সংযোজন করতে হবে, দশজন নির্বাচিত ব্যক্তির প্রত্যেকেই দশ দশটি করে হাদীসের মতন অন্য দশটি হাদীসের সনদের সঙ্গে সংযুক্ত করে পাঠ করবেন এবং ইমাম সাহেবকে ঐগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যুক্তি অনুসারে কাজ করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি সাধারণ সভা আহূত হলো। ইমাম সাহেবকে পরীক্ষা করার কথা দিকে দিকে প্রচারিত হলে মহানগরীর বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক দলে দলে এসে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে লাগলেন। অতঃপর পূর্ব ব্যবস্থা মত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত দশটি হাদীসের একটি মতন অন্য হাদীসের সনদসহ পাঠ করলেন, পাঠান্তে জিজ্ঞাসিত হয়ে ইমাম সাহেব উত্তর করলেন, "লা-আদরি অর্থাৎ আমি অবগত নই।"

এভাবে সর্বমোট একশ হাদীস পাঠ করে শুনালেন। ইমাম সাহেব প্রত্যেকটির উত্তর একই ভাবে 'আমি অবগত নই'—এ জবাব দিলেন। সভার যারা অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিল তারা কতকটা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে পড়লো। তাদের এতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, ইমাম সাহেব এই পরীক্ষায় বুঝি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও অকৃতকার্য হলেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সব বুঝতে পেরে বললেন—ইমাম সাহেব এদের ছল-চাতুরি ধরে ফেলেছেন।

সকলের প্রশ্ন শেষ হলে ইমাম সাহেব স্ফীত বক্ষে দাঁড়িয়ে প্রথম হাদীস বর্ণনাকারীকে সম্বোধন করে তার প্রশ্নের ১ম হাদীসটি তারই বর্ণিত বিকৃত সনদসহ আবৃত্তি করে বললেন, "আপনার প্রথম বর্ণিত হাদীসের ইসনাদ ভুল, উহার সহীহ সনদ এরূপ।" এভাবে দশজনে প্রশ্নকারীর একশ হাদীসের প্রত্যেকটির ভুল সনদ সংশোধন করে সঠিক সনদসহ পুনরাবৃত্তি করে সকলকে চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত করে ফেললেন। মহানগরী বাগদাদের সর্বশ্রেণীর অধিবাসীগণ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ স্মৃতি শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ কণ্ঠে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে করতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইমাম বুখারীর অসাধারণ প্রতিভা, অপরিসীম বিদ্যাবত্তা এবং ইসলামী শাস্ত্রসমূহে জ্ঞানের গভীরতার বিষয় জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিকট হতে শিক্ষালাভের আকুল আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে বর্ধিত হতে লাগল। জ্ঞানাম্বেষী ব্যক্তিগণ দলে দলে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ইমাম সাহেব শিক্ষার্থীদের এই ঐকান্তিক সনির্বন্ধ অনুরোধে অধ্যাপনার কার্য শুরু করতে মনস্থ করলেন।

হাশেদ ইবনে ইসমাইল বর্ণনা করেন, "ইমাম বুখারী যখন কোন স্থানে গমন করতেন তখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুসরণ করতেন। এমন কি অনেক সময় তাঁর পথ রোধ করে পথে-প্রান্তরে তাঁকে বসিয়ে তাঁর নিকট হতে হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এ অবস্থায়ও সহস্র সহস্র লোক সে সব স্থানে গিয়ে ভিড় জমাতেন। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফ স্পষ্টরূপে দেখা দেয়নি। তিনি তখন নব্যযুবক মাত্র, তাঁর মুখমণ্ডলে দাড়ি-গোঁফ প্রকাশ পায়নি।[১]

আগেই বলেছি, ইমাম সাহেব অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করলে অল্পদিনেই তাঁর সুষ্ঠু ও সাফল্যজনক শিক্ষাদানের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক জংগলের আগুনের মতোই। দলে দলে লোক তাঁর শিক্ষাগারে উপস্থিত হতে থাকে। লোকের সমাগম এত অধিক হয় যে, তথায় বিন্দুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট থাকে না।

---

১. কাশতালানী ঃ পৃঃ ৩১

ইমাম সাহেব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে বসরা, বাগদাদ, বুখারা, তারতুস, বলখ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবনের শেষভাগে স্থায়িভাবে বুখারায় থাকিয়া অধ্যাপনার কাজ পরিচালনা করেন। ইমাম সাহেবের মেধাবী ছাত্রগণের মধ্যে যাঁরা অতি উচ্চ শ্রেণীর ফকিহ্ এবং জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিসরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. সহীহ মুসলিম শরীফের সংকলক ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আন-নায়শাপুরী আল-কুশাইরী (মৃঃ ২৬১ হিঃ–৮৬৫ খৃঃ)

২. সুনানে-নাসায়ীর সংকলক ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমদ বিন শুআইব আন-নাসায়ী (মৃঃ ৩০৩ হিঃ–৯১৫ খৃঃ)।

৩. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ-বিন-ইমাম তিরমিযী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ–৮৯৩ খৃঃ)।

৪. ইমাম মোহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী (মৃঃ ২৯৪ হিঃ)।

৫. ইমাম দারেমী (মৃঃ ২৫৫ হিঃ)।

৬.ইবনে খোয়াযা (মৃঃ ৩১১ হিঃ)।

ইমাম সাহেব যখন থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন তখন হতেই জনসাধারণ তাঁকে ফতওয়া প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তাঁর শিক্ষকগণ ফতওয়া প্রার্থিগণকে তাঁর নিকট হতে ফতওয়া গ্রহণের জন্য ইঙ্গিত দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারায় শিক্ষাদান কার্য শুরু করার পূর্বে তিনি ফতওয়া সংক্রান্ত কার্যগুলি স্থায়িভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেননি। ইমাম বুখারী স্বয়ং কিংবা তাঁর শাগরিদগণ তাঁর প্রদত্ত ফতওয়াগুলো স্বতন্ত্রাকারে সংকলিত করেননি বটে, কিন্তু বুখারী শরীফের 'তরজমাতুল বাব' বা অধ্যায়গুলোর প্রত্যেক বর্ণিত মাসআলা পবিত্র কুরআন-হাদীস অথবা সাহাবীদের 'আসর' (ঘটনাপঞ্জি) দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। প্রমাণসমূহের দলিল-দস্তাবেজগুলো এতে এমন সূক্ষ্মভাবে সংযোজন করা হয়েছে যে, সর্বসাধারণের পক্ষে এর মর্মোপলব্ধি দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মৃঃ ১১৭৬ হিঃ) প্রমুখ মনীষী এই 'তরজমাতুল বাব'কে কেন্দ্র করে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। অবশ্য ইমাম বুখারীর এই ফতওয়া প্রদান ব্যাপারে খুরাসান ও ইরাকের আহলুর-রায়গণ তাঁর বিরোধিতা করেন এবং বুখারার তদানীন্তন শাসনকর্তার মাধ্যমে তাঁর ফতওয়া প্রদান কার্য স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়। এভাবে রাজাদেশ বলে এই অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বন্ধ করে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ কাহিনীর উপসংহার এখানেই হয়নি। হিংসান্ধ ব্যক্তিরা ইমাম সাহেবের নামে মিথ্যা অভিযোগের জাল বিস্তার করতে থাকে। লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত আলেম আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী (মৃঃ ১৩০৪ হিঃ) কৃত 'আল

ফাওয়াইদুল লাহিয়া' নামক চমৎকার গ্রন্থখানা পড়ে আমরা জানতে পারি যে, ইমাম বুখারীই ছিলেন এ ব্যাপারে সত্য।

হাদীসের শ্রেষ্ঠতম সংকলক ইমাম বুখারী (র) স্বাভাবিক কবি ছিলেন না। কিন্তু কবিত্বশক্তি যে তাঁর ভিতর লুক্কায়িত ছিল, তার পরিচয় মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোন কোন সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর রসনা হতে অনর্গল অনুপম উপদেশমূলক কবিতা নিঃসৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইমাম আবু আবদুল্লাহ হাকেম (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) ইমাম বুখারীর রচিত কিছু কিছু কবিতার উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শাগরিদ হাফেজ আবদুর রহমান দারেমীর (মৃঃ ২৫৫ হিঃ) আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ শুনে দারুণ শোকে অভিভূত হয়ে শোকাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার বাংলা তরজমা হচ্ছে এই–'যদি দীর্ঘায়ু হও, তবে বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু সংবাদে তোমাকে শোকাভিভূত হতেই হবে, তাই জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করা তোমার জন্য বেশ দুর্বিষহ ও কষ্টদায়ক।' আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী তাঁর 'তাবাকাতে কুব্‌রা' নামক গ্রন্থে ইমাম বুখারীর কিছু কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইমামুল-মুহাদ্দেসিন মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীর ইন্তিকালের কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও মর্মবিদারক। ইমাম বুখারীর জীবন-লীলা সমাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণের জন্য বুখারার কতিপয় নীচমনা ব্যক্তির অমানুষিক দুর্ব্যবহার এবং স্থানীয় শাসনকর্তার আক্রোশজাত নিষ্ঠুর আচরণকে দায়ী করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। এর কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো ঃ

ইমাম বুখারী (র) যথাসাধ্য সুলতান ও তাঁর আমীর-ওমরাহের সংস্রব হতে দূরে অবস্থানের চেষ্টা করতেন এবং অযথা তাঁদের স্তুতিবাদ ও তোষামোদ হতে বিরত থাকতেন। তিনি মনে করতেন, তাঁদের সংসর্গে আসলে সঠিকরূপে ধর্মপথে চলা সম্ভবপর হবে না।

তখন খালিদ ইবনে আহমদ জহলি বুখারার গভর্নর ছিলেন। ইমাম সাহেব যখন বুখারায় হাদীস অধ্যাপনায় রত এবং চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত, তখন গভর্নর জহলি ইমাম সাহেবকে তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তদীয় পুত্রগণকে সহীহ বুখারী ও তাওয়ারিখে কবীর গ্রন্থ শিক্ষাদানের জন্য আবেদন জানান। ইমাম সাহেব নীতির দিক দিয়ে গভর্নরের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি গভর্নরের আক্রোশের ভয়ে ভীত না হয়ে নির্ভীককণ্ঠে হেলাভরে উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, তিনি স্বীয় শিক্ষাদান কেন্দ্র পরিত্যাগ করে

তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে পবিত্র বিদ্যার অবমাননা করতে আদৌ প্রস্তুত নন। একথা শুনে গভর্নর পুনরায় আবেদন জানান যে, প্রাসাদে উপস্থিত হতে যদি তাঁর কোন আপত্তি থাকে তা'হলে ইমাম সাহেবের পাঠাগারেই তাঁর পুত্রগণকে পাঠানো যেতে পারে কিন্তু সে অবস্থায় শাহজাদাদের সঙ্গে যাতে সাধারণ ছাত্রগণ একত্রে মেলামেশার সুযোগ না পায়, তজ্জন্য তাঁদের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্বরূপ নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে নিতে হবে। এর উত্তরে ইমাম সাহেব জানান–"আমি এরূপ অনুরোধ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমার এই শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সাধারণ সম্পত্তি ; রিসালাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এতে বাদশাহ-ফকীর, ধনী-দরিদ্র সবার রয়েছে সম-অধিকার। সুতরাং আমার শিক্ষাগার বা মসজিদের দ্বার সকল শ্রেণীর লোকের জন্য অবারিত ও সদা উন্মুক্ত। তাই লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ ও আপামর জনসাধারণকে বঞ্চিত করে নবী করীমের এই ইসলামকে শুধু আমীর-ওমরাহদের জন্য আমি কুক্ষিগত করতে পারি না। কারণ, এতে করে এই পবিত্র শিক্ষাকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। অধিকন্তু পিপাসাতুর ব্যক্তিরা স্বয়ং কূপের কাছে হাজির হয়ে থাকে। কূপ কখনও তৃষ্ণার্তদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় না। তাই যাঁর ইচ্ছা হবে তিনি স্বয়ং সানন্দে আমার মসজিদ বা বাড়িতে এসে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। শিক্ষার পথে আমি কারো জন্য কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি বা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারি না। এবং আপনি যদি আমার এই ব্যবস্থাবলম্বনে একান্তই নারায হন আর বলপ্রয়োগে আমার শিক্ষাদান কার্যে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হন তবে আমি এ ব্যাপারে আদৌ শঙ্কিত নই। কারণ আপনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমার এই শিক্ষাদান কার্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে আমি রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে এই বলে ক্ষমার্হ হতে পারবো যে, স্বেচ্ছায় আমি শিক্ষাদান বন্ধ করিনি।"

হাদীসে কুদসীর মধ্যে আছে, আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন– "যারা আমার প্রিয়পাত্রের সঙ্গে দুশমনী করে, আমি স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" এখানেও ঠিক তাই হলো। ইমাম সাহেবের নিকট হতে এরূপ অপ্রত্যাশিত জবাব পেয়ে গভর্নর দারুণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। তৎপর তিনি তাঁকে যে কোন উপায়ে শহর হতে বিতাড়িত করার পন্থা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি এক কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি কতিপয় নিচাশয় কুচক্রীর সাহায্যে ইমাম সাহেবের আকিদা ও বিশ্বাসের উপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে অল্পবুদ্ধি ও হুজুগপ্রিয় সাধারণ মুসলিমগণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলেন। প্রচার করা হলো যে, ইমাম সাহেব কুরআন মজীদের বচনগুলিকে মাখলুক বা সৃষ্টি বলে বিশ্বাস

করেন। এ নিয়ে শহরময় তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠল ও অশান্তির প্রবল অগ্নিশিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। উপযুক্ত সুযোগ বুঝে গভর্নর তাকে শহর ত্যাগের হুকুম জারি করলেন। নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হয়নি।

অবশেষে একদিন ইমাম সাহেব প্রিয় জন্মভূমির মায়াজাল কাটিয়ে বুখারা থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সত্যের এই নির্ভীক সৈনিক তবুও অসত্য ও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করলেন না। ইমাম সাহেব বুখারা হতে বহির্গত হয়ে বয়কন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগল। ফলে তিনি সমরকন্দ যান ও তথাকার অধিবাসীদের অনুরোধে খরতঙ্গ নামক নিভৃত পল্লীতে পৌঁছে তাঁর এক নিকট-আত্মীয় গালীব ইবনে জিবারিলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি কঠোর পীড়া আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় সমরকন্দবাসী-গণের পক্ষ হতে উপর্যুপরি দরখাস্ত আসতে থাকলে তিনি তথায় যাওয়ার মনস্থ করেন, কিন্তু পরে জানতে পারলেন যে, বুখারায় তাঁর বিরুদ্ধে ছড়ান বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করেছে। এ অবস্থায় মনের দুঃখে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলেন। পরে সমরকন্দবাসীগণ ভুল বুঝতে পেরে সকলেই একমত হয়ে ইমাম সাহেবকে তথায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করলে তিনি মোজা ও পাগড়ি পরিধান করে দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে সওয়ারীর উপর আরোহণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ১৫/২০ কদম অগ্রসর হয়েই বললেন–"আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দুর্বলতা বেড়ে চলেছে।" তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেস্থানে বসান হলো। ইমাম সাহেব উপরের দিকে হাত তুলে কাতরকণ্ঠে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানালেন। তাঁর দেহ-মন এতদূর দুর্বল ও শ্রান্ত বোধ হতে লাগল যে, তিনি আর এক মুহূর্তও থাকতে না পেরে সেখানেই শুয়ে পড়লেন।

তাঁর পবিত্র শরীর হতে অজস্র ধারায় অবিরাম ঘর্ম ছুটতে লাগল। তার পরক্ষণেই সব শেষ হয়ে গেল। ইসলাম-গগণের এ পূর্ণ শশধর ২৫৬ হিজরী সনের ঈদুল ফিতরের পবিত্র রাতে ৬২ বছর বয়সে চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল। সহস্র সহস্র বন্ধু-বান্ধব ও লক্ষ লক্ষ ভক্তকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে ও অশ্রুজলে ভিজিয়ে ইমামুল-মুহাদ্দিসিন আল্লামা মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র) অমর ধামে প্রস্থান করেন।... ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর নশ্বর দেহ থেকে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পরও অবিরল ধারায় স্বেদবিন্দু নির্গত হচ্ছিল। যথাসময়ে তাঁকে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করা হলো। এখন কোথায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে এ নিয়ে লোকসমাজে বিরোধ দেখা দিল। অবশেষে বহু বাদানুবাদের পর সর্বসম্মতিক্রমে মৃত্যুস্থান খরতঙ্গ পল্লীর নিভৃত

কোণে তাঁর অন্তিম সমাধি রচনার কথাই স্থিরীকৃত হলো। পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিবস যোহরের নামাযান্তে তাঁকে তাঁর চির বিশ্রাম কক্ষে শয়ন করিয়ে সকলে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করলেন। কথিত আছে, ইমাম সাহেবের কবরের চতুষ্পার্শ্বের মাটি সুগন্ধ ও সুঘ্রাণময় হয়ে যাওয়ায় অনেকে ঐ মাটি নিয়ে যেতে থাকে। তজ্জন্য কবরটি রক্ষাকল্পে এর চারদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়।

অররাক বলেন, "ইমাম সাহেব অন্তিমকালে অসিয়ত করে যান–তাঁকে যেন সুন্নাত মোতাবেক তিন খণ্ড বস্ত্র দ্বারা কাফন দেওয়া হয়, আর উষ্ণীষ যেন না থাকে।"

মিশকাত প্রণেতা আল্লামা অলীমুদ্দিন ইরাকী তাঁর 'ইকমাল' গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী কারী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'মিরকাত শারহে মিশকাত'-এর মধ্যে লিখেছেন যে, ইমাম বুখারী কোন সন্তান-সন্ততি রেখে যাননি। প্রকৃতপক্ষে ইমাম সাহেব তাঁর ঔরসজাত কোন সন্তান রেখে যাননি বটে, কিন্তু ইসলাম-জগতে তাঁর হাজার হাজার আধ্যাত্মিক বা রূহানী সন্তান বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত কাল পর্যন্তও থাকবে। ইমাম সাহেবের এই দুঃখপূর্ণ জীবনাবসানে বিশ্ব-মুসলিমের সুধী-সমাজ এমন কি আপামর জনসাধারণও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তার প্রতি ভক্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পার্থিব সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য অনেক সময় মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করে, আচরণকে উদ্ধত করে এবং তার লোভ ও স্বার্থপরতাকে উদ্দীপিত করে। এভাবে ধন-সম্পদ তাকে অন্যায় অথবা সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার প্ররোচনা দিতে থাকে; কিন্তু যারা আল্লাহকে সত্যি সত্যিই ভয় করেন, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)–এর বিধান অনুযায়ী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, একদিন আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে এবং প্রত্যেক পার্থিব আচরণের জন্য তাঁর সমক্ষে জওয়াবদিহি করতে হবে, ধন-সম্পদ কোনদিন তাদেরকে স্বার্থান্ধ করে তুলতে পারে না।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তা নেহায়েত সামান্য ছিল না। উক্ত টাকা খাটিয়ে যে ব্যবসা তিনি পরিচালনা করতেন তা-ও ক্ষুদ্র ছিল না।

ইমাম বুখারী সর্বদা ন্যায়-অন্যায় এবং বৈধতা-অবৈধতার প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যে, তাঁর ব্যবসায়-বাণিজ্য কোনদিন কোনরূপে কলুষিত হতে পারেনি। মৃত্যুকালে তিনি আবু হাফস্ নামক জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন,–"আমার ধন-সম্পত্তির মধ্যে হারাম অথবা সন্দেহযুক্ত কিছু নেই।"

সত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত প্রবল এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর এত গভীর ছিল যে, বিচারকের হস্তক্ষেপের সামান্যতম আশঙ্কার সম্ভাব্য কারণেও তিনি নিজের প্রাপ্য সহস্র সহস্র মুদ্রা পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহ অধ্যয়ন ও সংগ্রহকরণ, তা হতে বিশ্বস্ত হাদীসসমূহের নির্বাচন ও পৃথকীকরণের জন্য ইমাম বুখারী যেরূপ কঠোর শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, তেমনি জনসমাজে তাঁর সম্বন্ধে সততার ধারণা অটুট রাখার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হননি। এজন্য স্বীয় অর্থের আকর্ষণ অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হননি। এ সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করছি ঃ

একবার ইমাম সাহেব সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি পথের সম্বল স্বরূপ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠেন। আরোহীদের মধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি ইমাম সাহেবের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে ওঠে। একদা কথা প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব তাঁর স্বর্ণমুদ্রাগুলির কথা বন্ধুটির নিকট বেমালুম বলে ফেলেন। বন্ধুবর মুদ্রার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে তা করায়ত্ত করার ফন্দি এঁটে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে থাকেন। তার এই ব্যাকুল আর্তনাদে সকলেই উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলে সে বলে যে, তার এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। চুরির কথা শুনে সকলের মনে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর সমস্ত আরোহীর আসবাবপত্র তন্ন তন্ন করে তল্লাশি শুরু হয়।

ইমাম সাহেব সেই ধূর্ত ও কপট বন্ধুটির দুরভিসন্ধি বিলক্ষণ বুঝতে পারেন যে, অল্পক্ষণ পরে তাঁর পোঁটলা-পুঁটলিও তল্লাশি হবে ও স্বীয় স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে পড়বে। এই মুদ্রাগুলি তাঁর নিজের বললে লোকে কি তা বিশ্বাস করবে ? হয়তো কপট রোদনকারীর অভিসন্ধিই জয়যুক্ত হবে ; তাকে মিথ্যুক ও চোর প্রমাণিত করবে। এই অপবাদ তাঁর বিশ্বস্ততার উপর নিঃসন্দেহে একটা দূরপনেয় কলঙ্ক লেপন করে দেবে। এই ভেবে ইমাম সাহেব শেষে টাকার তোড়াটি এমনভাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন যাতে কেউ টের না পায়। তাঁর পোঁটলা-পুঁটলি তল্লাশি করে যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন সেই কপট রোদনকারী ব্যক্তিকে সকলেই ভর্ৎসনা করল এবং তারা তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতেও আদৌ কার্পণ্য করল না। নির্দিষ্ট সময়ে আরোহিগণ জাহাজ হতে নেমে স্ব স্ব গন্তব্য পথে গমন করলে শেষে ধুরন্ধর বন্ধুটি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি স্বর্ণ মুদ্রার তোড়াটি কি করলেন ? তিনি উত্তর করলেন, "আমি তখনই উহা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেছি।" লোকটি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করল–"আপনি এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা বিনষ্ট করে তা কিভাবে বরদাশ্‌ত করলেন ?" ইমাম

সাহেব বললেন, "তোমার জ্ঞান কোথায় ? বিশ্বস্ততার যে অমূল্য সম্পদ আমি আমার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা অর্জন করেছি তা সামান্য কয়েকটি মুদ্রার মোহে বিনষ্ট করে দিতে পারি না।"

আগেই বলেছি, ইমাম বুখারীর ব্যবসায়-বাণিজ্যে যা কিছু আয় হতো তা তিনি জনসাধারণের উপকারার্থে অকাতরে ব্যয় করতেন। বিশেষত প্রত্যেক মাসের আয় হতে তিনি পঁচিশ দিরহাম ফকীর, মিসকীন, মুহাদ্দিস ও ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করতেন। প্রধানত ছাত্র ও বিদ্বানমণ্ডলী তাঁর দানের বেশির ভাগ প্রাপ্ত হতেন।

আহার-বিহার ও বেশভূষায় তাঁর কোন আড়ম্বর বা জাঁকজমক ছিল না। তিনি শারীরিক আরাম-আয়েশ ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগের লালসা হতে বহু দূরে অবস্থান করতেন। দুঃখে-সুখে তাঁর ধৈর্যধারণ এবং বিপদাপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ইমাম বুখারীর চারিত্রিক সৌন্দর্যের বহু অনুপম নিদর্শন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য, অজস্র ঘটনাবলীর মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় তাঁর অনুপম চরিত্র মাহাত্ম্যের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলী উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠে।

একদিন ইমাম সাহেব আবু মাআশার যারীর (অন্ধ)-কে সম্বোধন করে বললেন- "হে আবু মাআশার! আমাকে দয়া করে মার্জনা করুন।" চক্ষুহীন আবু মাআশার এই অহেতুক ক্ষমা প্রার্থনার কোনই তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি অবাক বিস্ময়ে আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-"সে কি কথা ? আপনি এমন কি অপরাধ করেছেন যার জন্য আমার ন্যায় একজন খাদেমের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী !" ইমাম সাহেব তখন বললেন-"আপনি একদিন অতি প্রফুল্লচিত্তে হস্ত ও মস্তক হেলিয়ে দুলিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর একটি হাদীস পাঠ করছিলেন। সেদিন আপনার এ ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা দেখে আমি কিছুতেই হাস্য সংবরণ করতে পারিনি। তজ্জন্য আমি আজ লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত অন্তরে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

আবু মাআশার বললেন–"আল্লাহ পাক আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন ; এরজন্য আল্লহর কাছে আপনাকে কোন জওয়াবদিহি করতে হবে না।"

হযরত ইমাম বুখারী (র) অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। যে কাজ তিনি নিজে সম্পাদন করতে পারতেন তা সম্পন্ন করতে অপরের সাহায্য গ্রহণ তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি কোনদিন কারো গীবত, নিন্দাবাদ বা পরকীয়া চর্চা করেননি। তিনি বলতেন–"যেদিন থেকে আমি পরনিন্দাকে হারাম বলে জেনেছি, তারপর থেকে আমি কোনদিন কারো গীবত বা নিন্দাবাদ করিনি। আমি আশা করি যে, রোজ কিয়ামতে এজন্য কেউ আমার উপর দাবিদার হতে পারবে না।"

কুতায়বা ইবনে সাঈদ সাকফী ছিলেন ইমাম মালেক ও ইমাম লাইসের ছাত্র। এছাড়া তিনি ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ী প্রমুখেরও ওস্তাদ ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন–"আমি বহুদিন ধরে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের খিদমতে অবস্থান করেছি এবং যুগ যুগ ধরে তাঁদের কাছ থেকে অমূল্য জ্ঞান আহরণ করেছি। কিন্তু আমার জ্ঞানবুদ্ধি উন্মেষ হওয়ার পর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের মত সর্বগুণে গুণান্বিত আর কাউকে দেখিনি।"

ইমাম বুখারী (র) তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় কর্মশক্তি দ্বারা হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রিয় আমানতকে পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে আহরণ করে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য যে যথার্থ কল্যাণ সাধন করেছেন, জগদ্বাসীও তাঁর যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং যথার্থ মূল্য দিতে আদৌ কার্পণ্য করেননি।

সমসাময়িক বিশিষ্ট আলেম হুসাইন আজলী ইমাম বুখারী সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন–"আমি ইমাম বুখারী ও মুসলিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হাফেযুল-হাদীস আর কাউকে দেখিনি।" ইমাম মুসলিম সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু তবুও তিনি ইমাম বুখারীর ন্যায় ব্যাপক মর্যাদা ও কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম হননি। ইমাম বুখারী যখন কোন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন তখন আবু যুরআ ও আবু হাতিম রাযীর মতো মহাবিদ্বান ব্যক্তিগণও তন্ময় হয়ে নিবিষ্টচিত্তে তা শ্রবণ করতেন।

এই উভয় মনীষী মন্তব্য করতে গিয়ে আরও বলেন–"ইমাম বুখারী স্বয়ং ছিলেন এক উম্মত যিনি শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানী এবং সর্বশাস্ত্রে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইমাম যুহলী থেকেও তিনি কতক বিষয়ে ছিলেন অধিকতর জ্ঞানবান।"

ইমাম মুহম্মদ ইসহাক বিন খুযায়মা বলেন–"রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের আলেম নীল আকাশের নিচে ইমাম বুখারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।"

হাফিয মুসা ইবনে হারুন হাম্বাশ বলেন–"সৌর জগতের সমস্ত মুসলিম সমাজ একত্রিত হয়ে সমবেত চেষ্টা করলেও ইমাম বুখারীর ন্যায় একজন লোক বের করতে পারবে না।"[১]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসকালানী (মৃঃ ৮২ হিঃ) যথার্থই বলেছেন–"ইমাম বুখারীর উদ্ভাসিত প্রশংসায় পরবর্তীদের উক্তিসমূহ যদি উদ্ধৃত করা

১. তাক্‌য়ীদুল মুহমাল।

যায় তাহলে কাগজ শেষ হয়ে যাবে এবং আয়ু নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এ যেন এক অতল সাগর বিশেষ।"[১]

আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ (মৃঃ ৬৫২ হিঃ) বলেন-"ইমাম বুখারী ফিকাহ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম এবং ইজতিহাদ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।"

ইমাম বুখারীর সংকলিত গ্রন্থাবলী

১. 'আল-জামেউস সহীহ,-এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অনবদ্য অবদান। হাদীস শাস্ত্রের এই বিশ্বস্ততম গ্রন্থটি সম্পর্কে পরবর্তী মনীষীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লামা আইনী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) বলেন-"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সমস্ত আলেম এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহর মহাগ্রন্থ কুরআন মজীদের পরই সহীহ বুখারী ও মুসলিম অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়াতে আর নেই।"[২]

২. 'আত-তারীখুল কবীর—প্রথিতযশা ইমাম ইসহাক-বিন-রাহওয়াই (মৃঃ) গ্রন্থখানা পাঠ করে পুলক বিহ্বল অবস্থায় আমীর আবদুল্লাহ-বিন তাহির খুরাসানীর সামনে উপস্থাপিত করে আনন্দ গদগদকণ্ঠে বলেছিলেন, "হে আমীর ! আমি আপনাকে একটা যাদু দেখাচ্ছি।" এটি দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদের 'দাইরাতুল মা'আরিফ' উসমানিয়া থেকে ১৯৫৮-১৯৬২ খৃঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আত-তারীখুল আওসাত'-(এটি মধ্যম আকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থ)।

৪. 'আল-জামেউল কবীর'

৫. 'আসামিউস সাহাবা'-সম্ভবত এটিই সাহাবীদের নামাবলী সম্পর্কে প্রথম সংকলিত গ্রন্থ। পরবর্তী যুগে এ সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁরা এ গ্রন্থ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন ইমাম বুখারী (র)।

৬. 'কিতাবুল মাবসুত'-খলিলী তাঁর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে এ বইটির কথা বারবার উল্লেখ করেন।

৭. 'জুযউ রাফইল ইয়াদায়ন'-নামাযে হস্তদ্বয় উত্তোলন সম্পর্কে এই পুস্তিকা খানি লিখা হয়েছে। এতে হস্ত উত্তোলনের বিপক্ষ রেওয়ায়েতগুলোর অতি সূক্ষ্ম ও সার্থক সমালোচনা যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. 'জুযউল কিরাত খালফিল ইমাম'—এতে ইমামের পেছনে মুক্তাদী কর্তৃক সূরায়ে ফাতিহা পঠনের স্বপক্ষে দলীলপ্রমাণাদির সূক্ষ্ম আলোচনা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

---

১. মুকাদ্দমাই ফাতহুল বারী।
২. কাশফুয যুনুন ঃ ১পৃঃ ৪২৬, আইনী কৃত উমদাতুলকারী ১পৃঃ ৮।

৯. 'আত্-তারীখুস সাগীর'–এটি ইমাম সাহেবের অতুলনীয় অবদান। সুখের বিষয়, এটি ভারতের এলাহাবাদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১০. 'খাল্কু আফ্ আলিল ইবাদ'–এ গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেঈদের অনুসৃত রীতি হিসেবে 'বাতিলী ফিরকা'সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১১. 'কিতাবুয যুআফাইস সাগীর'–এতে বর্ণানুক্রমিকভাবে দুর্বল রাবিগণের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১২. 'আল মুসনাদুল কাবীর' 'আত্-তাফসীরুল কাবীর'–এই গ্রন্থদ্বয়ের কথা ইমাম সাহেবের অন্যতম শাগরিদ আল্লামা ফরাবরী উল্লেখ করেছেন।

১৩. 'কিতাবুল অহদান'–এটি আগ্রা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. 'কিতাবুল ইলাল'–এতে হাদীসের দোষ-ত্রুটি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. 'কিতাবুল কুনা'–এটি ১৯৪১ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে 'দাইরাতুল মা'আরিফ' উসমানিয়া থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

১৬. 'আল আদাবুল মুফরাদ'–এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার-ব্যবহারের আলোচনা সম্বলিত একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ভূপালের প্রখ্যাত মনীষী অগণিত গ্রন্থ প্রণেতা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ–১৮৯০ খ্রীঃ)-এর একখানা চমৎকার পূর্ণাংগ ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, মাওলানা আবদুল গাফফার সাহেব মরহুমও একে উর্দুতে ভাষান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন।

১৭. 'কিতাবুর রিকাফ'–হাজী খলীফা কৃত কাশফুয্ যুনুনে এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ইমাম বুখারী স্বয়ং তাঁর কিতাবের বিশেষ বিশেষ স্থানে এই হাদীস গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৮. 'বিররুল ওয়ালিদাইন'–এ গ্রন্থে পিতামাতার প্রতি ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

১৯. 'কিতাবুল আশরিবা'–ইমাম আবুল হাসান দারকুতনী (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ) তাঁর 'আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ' নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আদম তাওরাবিশী বলেন,'একরাতে আমি স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম (সা)-কে দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-সহ একস্থানে অপেক্ষমাণ অবস্থায় যেন কারও পথপানে চেয়ে রয়েছেন। আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কার আগমন

প্রতীক্ষা করছেন ?" রাসূলুল্লাহ (সা) জওয়াব দিলেন, "আমি মুহম্মদ ইবনে ইসমাইলের প্রতীক্ষায় রয়েছি।"

স্বপ্ন বর্ণনাকারী বলেন–"কিছুদিন গত হওয়ার পরই আমি হঠাৎ করে ইমাম বুখারীর ইনতিকালের খবর পেলাম। তখন আমি ঠিকমতো হিসাব করে স্বপ্নের তারিখ ও সময় মিলিয়ে নিলাম। তাতে দেখতে পেলাম যে, ঠিক সেইদিন এবং সেই সময়ের মধ্যেই ইমাম সাহেবের মৃত্যু ঘটেছে। এই স্বপ্নের মাধ্যমে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারীর পবিত্র আত্মা ইহধাম ত্যাগ করে অমরধামের সেই অনন্তলোকে আতিথ্য গ্রহণ করলে স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা করেন।

সহীহ হাদীসের মধ্যে আঁ হযরত (সা) ফরমিয়েছেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখতে পায়, সে যেন প্রকৃত প্রস্তাবে আমাকেই দেখে থাকে ; কারণ অভিশপ্ত শয়তান কখনও আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।"

নজম ইবনে ফুজাইল নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ণনা করেন–"হযরত রাসূলে করীম (সা) তাঁর রওযা শরীফ থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং ইমাম বুখারীও তাঁর পেছনে অনুসরণ করেছেন। আঁ হযরত (সা) যে যে স্থানে পা-রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, ইমাম বুখারীও তাঁর অনুধাবন করতে গিয়ে ঠিক ঐসমস্ত স্থানসমূহে পা রেখে হাঁটছেন। বুখারা নিবাসী আবু হাতিম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তিও ঠিক এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

আবূ যায়দ মারওয়াযী (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) নামক প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা বর্ণনা করেন,"আমি একদিন পবিত্র কাবা ঘরের সংলগ্ন স্থানে শায়িত ছিলাম, এমন সময় স্বপ্নে দেখতে পেলাম, রাসূলে আকরাম (সা) সৌম্য মূর্তি নিয়ে আমার সামনে হাযির। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন,"হে আবূ যায়দ ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফেয়ীর (মৃঃ ২০৪ হিঃ) কিতাব পড়াতে থাকবে ? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা শুরু কর।" আমি সবিনয়ে আরয করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার কিতাব কোন্‌টি ?' তখন আঁ হযরত (সা) স্নিগ্ধ কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, "মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র) যে অনবদ্য হাদীস গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই হচ্ছে আমার কিতাব।"

আল্লাহ পাকের পবিত্র কুরআন মজীদের পরই যেমন সহীহ বুখারীর স্থান, ঠিক তেমনি সহীহ বুখারীর যতটা ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনি লেখা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহর

---

১. 'আনওয়ারুল মাসাবীহ' এবং 'মুকাদ্দমা-ই-ফাতহুল বারী'।

কিতাব ছাড়া অন্য কোন কিতাবের এতটা লেখা হয়নি। কেউ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেছেন, কেউ শুধু এর সনদ বা বর্ণনাকারী রাবী পরম্পরার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ এর কঠিন ও দুরূহ শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যার দিকে মনঃসংযোগ করে খাস অভিধান রচনা করেছেন। আবার কোন কোন মনীষী শুধু ব্যাকরণগত প্রশ্নসমূহের জটিলতা মীমাংসার জন্য নযীর আহরণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখক এর শর্তসমূহের আলোচনা করেছেন। আবার কোন কোন হাদীসের সমালোচনার (তানকীদ) উপর আলাদাভাবে বৃহদাকার গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেছেন। অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদ মনীষী এর 'হাশিয়া' ও 'তা' লিকাত' সংকলনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ বিশদ ব্যাখ্যা, কেউ সংক্ষিপ্ত আকারে আর কেউ মধ্যমাকারে ভাষ্য রচনা করতে মনোনিবেশ করেছেন। মোট কথা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথক মনোভাব ও পৃথক উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপন আপন গ্রন্থ রচনায় তৎপর হয়েছেন।[১]

সহীহ বুখারীর শরাহ বা ভাষ্যসমূহের কূল-কিনারা পাওয়া সত্যিই দুষ্কর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই বিশাল সমুদ্র মন্থন করে বর্তমানে এর তালিকা নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।। মোল্লা কাতেব চাল্পী (১০৫২ হিঃ) তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশ্ফুয যুনুনে' এর আশিখানা ভাষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গুলোর সাথে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শরাহসমূহ যোগ করলে প্রায় দেড় শতের অধিক হবে বলে মনে হয়। এ থেকে অতি সহজেই সহীহ বুখারীর সর্বতোমুখী জনপ্রিয়তা ও অপূর্ব গুরুত্ব সম্পর্কে কতকটা আঁচ করা যায়। নিম্নে আমি এর কতিপয় প্রসিদ্ধ 'শরাহ'র নামোল্লেখ করছি ঃ

১. আবু সুলায়মান খাত্তাবী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ) কৃত সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম 'শরাহ'টির নাম ই'লামুস সুনান। এর অনুলিপি কনস্টান্টিনোপলের সুপ্রসিদ্ধ আয়াসুফিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

২. বদরুদ্দীন যারকাশী (মৃঃ ৭৯৪ হিঃ) কৃত সংক্ষিপ্ত ও উৎকৃষ্ট ভাষ্যটির নাম 'আত-তানকীহ'। এটি পাটনার ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত।

৩. হাসান সাগানী লাহোরী (মৃঃ ৬৫০ হিঃ) কৃত শরহে বুখারী।

৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইউসুফ আল কিরমানী (মৃঃ ৭৮৬ হিঃ) কৃত ভাষ্যের নাম 'আল-কাওয়াকিবুদ্দোরারী'। লেখক মক্কা শরীফে এর সম্পাদনা কার্য সম্পন্ন করেন। কনস্টান্টিনোপলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এটি সুরক্ষিত।

---

১. 'ফাযায়িলে হাদীস' মওলানা আবদুস সালাম বাস্তভী ও 'আনওয়ারুল মাসাবীহ'

৫. হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) কৃত 'ফাতহুল বারী' একখানি অতি উপাদেয় জ্ঞানসমৃদ্ধ ও গবেষণাপূর্ণ শরাহ্। এটি হাফিজ সাহেবের সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অমৃতময় ফলশ্রুতি। এ পর্যন্ত সহীহ বুখারীর যতগুলো ভাষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তন্মধ্যে এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় এবং অতুলনীয়। এর প্রণয়ন-কার্য সমাপ্ত হলে হাফিজ সাহেব স্বয়ং পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে এক সুন্দর প্রীতিভোজ দ্বারা আপামর জনসাধারণকে আপ্যায়িত করেন এবং সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেমদের খিদমতে তা' পেশ করেন। অতঃপর তদানীন্তন রাজা-বাদশাহরা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এই অনবদ্য গ্রন্থখানি খরিদ করে নেন। ভারত ও মিসরের বিভিন্ন প্রেস থেকে বহুবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) কৃত 'উমদাতুল কারী'। এটি বৈরুত থেকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কাশফুয-যুনুনের লেখক হাজী খলীফা বলেন–"আল্লামা আইনী তাঁর এই ভাষ্যগ্রন্থে ফাতহুল বারী থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এমন কি কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা হুবহু উদ্ধৃত করে ফেলেছেন। বুরহানুদ্দীন ইবনু খিযরের কাছ থেকে তিনি উক্ত গ্রন্থখানি ধার করে নিয়ে কোন কোন স্থানে ইবনু হাজারের হুবহু অনুসরণ করেছেন। সে যাই হোক, আল্লামা আইনীর এই ভাষ্যখানি একটা সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু 'ফাতহুল বারী'র ন্যায় গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অথবা আজ পর্যন্ত তদ্রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়নি।[১]

৭. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) কৃত সংক্ষিপ্ত অথচ উৎকৃষ্ট ভাষ্যদ্বয়ের নাম হচ্ছে যথাক্রমে 'তাওশীহ' এবং 'তারসীখ'। প্রথমোক্ত ভাষ্যটি তুরস্কের সুলতান আহমদ খাঁর (৩য়) কনস্টান্টিনোপলস্থিত শরিফী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

৮. আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী (মৃঃ ৯২৩ হিঃ) তাঁর অতি উপাদেয় ভাষ্যখানি 'ফাতহুল বারী' প্রমুখ বৃহদাকার শরাহ থেকে উপকরণ নিয়ে রচনা করেছেন। এর নাম 'ইরশাদুস সারী'। এই চমৎকার গ্রন্থটির সূচনায় একটা সুন্দর ভূমিকাও সংযোজিত হয়েছে। সুখের বিষয়, এটি মুদ্রিতাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই উপকারী।

৯. আল্লামা ইয়াকুব বানানী কৃত 'আল-খায়রুল জারী' নামক শরাহটির অনুলিপি পাটনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার 'ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী'তে সংরক্ষিত আছে।

---

১. কাশফুয যুনুন (মিসর) ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ৩২৭–২৮

১০. সাইয়েদ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) কৃত 'ফায়যুল বারী' নামক শরাহর কথা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ ১৮৯০ খৃঃ) স্বীয় 'ইত্তেহাফুন্নু বালাতে' উল্লেখ করেছেন।

১১. Fl. Bokeari les tradition lamiques—সহীহ বুখারীর ফরাসী ভাষায় Marcais অনুবাদ। অনুবাদক O.Handas and W.Marcais বিষয় নির্বাচন সূচী প্রণয়ন ও শব্দাবলী হরফে তাহাজ্জীর ক্রমানুসারে (Alphabetical order) প্রয়োজনীয় নোটসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থখানি ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস থেকে মুদ্রিত এবং ৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে । প্রথম খণ্ড ৬৮২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

১২. শায়খ নুরুদ্দীন আহমদাবাদী (মৃঃ ১১৫৫ হিঃ) কৃত 'নুরুল ক্বারী'। আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী এই গ্রন্থের কথাও স্বীয় "ইত্তেহাফুনন্নুবালা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

১৩. আল্লামা ইসমাঈল আজালুনী (মৃঃ ১১৬২ হিঃ) কৃত আল ফাইযুল বারী। এই ইসমাঈল আজালুনী ছিলেন আল্লামা সিন্ধীর প্রিয় শিষ্য। তিনি 'জামে উমাবীর কোব্বা নসরে সহীহ বুখারী শরীফ শিক্ষাদানকালে ১১৪১ হিজরীতে এই ভাষ্য রচনার কাজ শুরু করেন। গ্রন্থকার এই শরাহর মধ্যে এর রচনার কারণ এবং কৈফিয়তও বর্ণনা করেছেন।

১৪. আলী ইবনু নাসারুদ্দীন মুহাম্মদ আল-মালিকী কৃত 'মাউনাতুল ক্বারী'। ইনি ছিলেন আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতীর শিষ্য। তাঁর এই ভাষ্যের কথা আল্লামা ইসমাঈল আজালুনীও (মৃঃ ১১৬২ হিঃ) 'ফাওয়াইদুদ্দারারী'তে উল্লেখ করেন।

১৫. আল্লামা গোলাম আলী আযাদ আল বিলগিরামী কৃত 'যওউদদ্দারারী'। এতে সহীহ বুখারীর শুরু থেকে 'কিতাবুয যাকাত' পর্যন্ত অংশের ভাষ্য স্থান পেয়েছে। গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁর সুবহাতুল-মিজান নামক অনবদ্য অবদানে এই ভাষ্যের কথা উল্লেখ করেন।

১৬. সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-আহদাল ইয়ামেনী আল কাতেল কৃত 'সুল্লামুল ক্বারী'। নওয়াব আবু তাইয়েব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'আল-হিত্তা' গ্রন্থে এই ভাষ্যের কথা এবং এর পূর্ববর্তী ভাষ্য "যওউদ্দ্দারারী"-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ভূপালী আরও বলেন, 'যওউদ্দ্দারারী' নামক ভাষ্যটি বেশ বিস্তৃতাকারে লেখা শুরু হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকর্তা আল্লামা বিলগিরামী তাঁর জীবদ্দশায় এটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।

১৭. আল্লামা শাইখ হাসান আদবী (মৃঃ ১৩০৩ হিঃ) কৃত 'নুরুস্ সারী'। এটি কায়রো থেকে ২১৭৯ হিজরীতে দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮. মির্যা হায়রাত দেহলভী কৃত 'হাল্লু সাহীহিল বুখারী'। এতে মাওলানা হাফেজ আহমদ আলী সাহেব সাহারানপুরীর (মৃঃ ১২৯৮ হিঃ) অনুসৃত রীতি অবলম্বন করে 'মতন' (Arabic Text) ঠিক রেখে ফতহুহ বারী কাসতাল্লানী প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভাষ্য গ্রন্থ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করে শুধু কঠিন কঠিন স্থানসমূহে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া এতে দুরূহ শব্দমালার আভিধানিক শব্দও সংযোজিত হয়েছে। মির্যা হায়রাত দেহলভীর সরল উর্দু অনুবাদ, হাসিয়া এবং টীকা প্রটীকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মতন (Arabic Text) এবং তরজমা আলাদা আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়েছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মাঝে সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। শুধু এর সূচীপত্রই ১৪৪ প্রষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। অনুবাদ বেশ স্বচ্ছ, সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী।

১৯. শাহাবুদ্দিন আহমদ আল-হানাফী আশ শারাজী আয্-যাবিদী (৮১১-৮৯৩ হিঃ) কৃত 'আত্তাজরীদুস্ সারহী লি আহাদিসিল জামেইস সাহীহ'। এটি সহীহ বুখারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কায়রো নগরী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আল্লামা যাবিদী কৃত এই 'তজরীদ' গ্রন্থের আবার ভাষ্য লিখেছেন আল্লামা শায়খ শারকাবী, আল্লামা শায়খুল গাযযী এবং আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ কন্নৌজী ভূপালী। এই শেষোক্ত মনীষীর ভাষ্যের নাম 'আওনুল বারী'। এটি কায়রো থেকে 'নাইলুল আওতারের হাশিয়ায় (Border) মুদ্রিত হয়েছে।

২০. আল্লামা বদরুদ্দীন হাসান আল হালাবী (মৃঃ ৮৭৫ হিঃ) কৃত 'ইরশাদুস্ সামি ওয়াল কারিয়িল মুনতাকা'। এতে সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহের সহজ, সরল এবং বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২১. আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবি জামরাহ আল আযাদী (মৃঃ ৬৭৫ হিঃ) কৃত 'আন্নিহায়াহ'। এটিও এর ন্যায় সহীহ বুখারীর একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এর হাশিয়া লিখেছেন আল্লামা মুহাম্মদ শানওয়াজী। হাশিয়াসহ এটি কায়রো নগরী থেকে ১৩০৪ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থকার (আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ আল আযাদী) স্বয়ং এই 'আন্নিহায়াহ' গ্রন্থের আর একটি বিস্তৃত টীকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এর নাম 'বাহজাতুন্নুফুস'। কনস্টান্টিনোপলের ওয়ালীউদ্দীন সুলতান বাইয়াযীদের জামে শরিফীতে এটি সংরক্ষিত।

২২. 'হাল্লু সাহীহিল বুখারী' নামক সহীহ বুখারীর প্রাচীনতম ও বৃহদাকার ভাষ্যখানি শায়খুল-কুল ফীল কুল শামসুল উলামা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর (মৃঃ ১৩৬০ হিঃ) নিজস্ব পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। এই মহামূল্য ভাষ্যখানি প্রাচীন হলেও বেশ ঝকঝকে তক্‌তকে এবং অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ। প্রত্যেক যুগের বড় বড় খ্যাতিমান মনীষী সহীহ বুখারীর শিক্ষাদান কালে

এই প্রাচীন গ্রন্থটিকে সামনে রাখতেন। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে, স্থান পাত্র ও সুযোগ মতো এর উপর হাশিয়াহ এবং ফুট নোট লিখেছেন। এ জন্যই এতে কোন শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। স্বয়ং হযরতুল আল্লামা শায়খুল-কুল মিঞা নাযীর হুসাইন সাহেব দেহলভীর স্বহস্ত লিখিত মূল্যবান 'হাশিয়াহ'ও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এভাবে যুগের পর যুগ ধরে খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার অমৃত ফলশ্রুতি হিসেবে এ গ্রন্থটি সবদিক দিয়েই পূর্ণত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত শায়খুল কুল্ মিঞা নাযীর হুসাইন সাহেব এই গ্রন্থখানিকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে করে অতি যত্নসহকারে যক্ষের ধনের ন্যায় আগলে নিয়ে থাকতেন। অবশ্য পরোপকারের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে হস্তান্তরও করতেন। তাই মওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (মৃঃ ১২৯৮ হিঃ) যখন আরবী হাশিয়ার সঙ্গে সর্ব প্রথম এই সহীহ বুখারীকে হিন্দুস্থান থেকে প্রকাশ করেন তখন তিনি সব চাইতে বেশি এই গ্রন্থ থেকেই অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেন। আল্লামা নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। তাই একাধিকবার তিনি তাঁর কাছ থেকে এটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া মওলানা সাহারানপুরি সাহেব স্বীয় হাশিয়ায় 'শারহু দাউদী,' কাসতাল্লানী, ইবনু হাজার আসকালানী কৃত 'হাদিউস সারী' এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী কৃত 'তারাজিমু আবওয়াবিল বুখারী' থেকেও যত্রতত্র অকুণ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করেন।

২৩. স্বনামখ্যাত মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল হক সাহেব দেহলভীর যোগ্যতম সন্তান মওলানা নুরুল হক সাহেব (মৃঃ ১০৭৩ হিঃ) প্রণীত 'তাইসীরুল ক্বারী'। এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত। পিতা আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী যখন ফার্সী ভাষায় 'মিশকাত শরীফের' টীকা লিখতে শুরু করেন ঠিক সে সময় তাঁর যোগ্যতম পুত্র মওলানা নূরুল হক সাহেব ফার্সী ভাষায় সহীহ বুখারীর এই ভাষ্য রচনায় হাত দেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানই বটে।[১]

২৪. শাইখুল ইসলাম প্রণীত 'শারহে বুখারী ফার্সী'। ইনি মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর (মৃত ১০৫২ হিঃ) পৌত্র। এই ভাষ্যখানি 'তায়সীরুল ক্বারী'র ভাবার্থমূলক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এতে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনি সংযোজিত হয়েছে।

---

১. মওলানা আবদুস সালাম মুবারকপুরী কৃত সীরাতে বুখারী এবং আগা মুহঃ রফীক বুলন্দশহরী কৃত তাযকিরায়ে মুহাদ্দিসীন।

২৫. মোল্লা হাসান সিদ্দিকী পাঞ্জাবী লিখিত 'মিনাহুল বারী'। ইনি আল্লামা দারায পেশাওয়ারী নামেও সাধারণ্যে সুপরিচিত। এই চমৎকার ভাষ্য গ্রন্থটিও ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ। এটি টোঙ্কের নওয়াব সাহেবের সৌজন্যে আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ 'রিজাজুল বুখারী' ও 'শারহু তারাজিমে আবওয়াবে'র সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

২৬. নওয়াব ওয়াকার জংগ বাহাদুর মওলানা ওয়াহীদুযযামান সাহেব হায়দরাবাদী অনূদিত 'তায়সীরুল বারী'। এটি বেশ স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাবার্থমূলক অনুবাদ গ্রন্থ। সুযোগ্য গ্রন্থকর্তা এর শুরুতে একটি অতি মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সংযোজন করেছেন। নিজের 'সিলসিলায়ে সনদ' বা হাদীস বর্ণনাকারীর পরম্পরা সূত্রকে তিনি ইমাম বুখারী (র) পর্যন্ত দশম ধাপে মিলিয়ে দিয়েছেন। স্থানে স্থানে সুন্দর হাসিয়া ও সরল বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। লাহোর থেকে এটি আকর্ষণীয় মনোরম প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'ফাযলুল বারী' নামক সহীহ বুখারীর উর্দু অনুবাদটিও লাহোর থেকেই মুদ্রিত হয়েছে।

২৭. English Translation of Sahih Bukhari, সহীহ বুখারীর এই ইংরেজী তরজমার অনুবাদক ক্রিজান নামক ইউরোপিয়ান। এটি ১২৯৬ হিজরীতে বুলাক শহর থেকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।[১]

২৮. জালালউদ্দীন আবদুর রহমান আল বালকিমী (মৃঃ ৮২৪ হিঃ) প্রণীত "আল ইফহাম ফী ইবহামিল বুখারী।" ৮২২ হিজরীতে সংকলিত এই গ্রন্থখানি কনস্টান্টিনোপলের ওয়ালীউদ্দীন সুলতান বায়াযীদের জামে শরিফী এবং আয়াসুফিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

২৯. আবু নসর আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল-কালাবাযী (মৃঃ ২১৮ হিঃ) কৃত 'আসমাউ রিজালিল বুখারী'। 'কাশফুয যুনুনে'র লেখক হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্পীও এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩০. আল্লামা আবু তাইয়েব মুহাম্মদ শামসুল হক ডয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ-১৯১১ খ্রীঃ) কৃত 'রাফউল ইলতিবাস'। এটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং পঠনযোগ্য পুস্তক। সহীহ বুখারীতে যে সমস্ত জায়গায় 'কালা' বা 'যুন্নাস' উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা এতে স্থান পেয়েছে। ১৩০৯ হিঃ এটি দিল্লী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩১. আবুল কাশিম হিবাতুল্লাহ ইবনু হাসান আত-তাবারী (মৃঃ ৪১৮ হিঃ) কৃত 'রিজালুস সাহীহায়ন'। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের 'রু'আত' বা বর্ণনাকারীদের জীবন কাহিনীই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

---

১. Encyclopaedia Britanica,

৩২. আল্লামা ফাকীরুল্লাহ প্রণীত 'মাসাবীহুল ইসলাম'। এটি ফিকহী প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করে এবং মস'আলার শৃঙ্খলা ক্রমানুসারে সহীহ বুখারী থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহের সংকলন। সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর যাঁরা আমল করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য এ গ্রন্থটি একটা উৎকৃষ্টতর অমূল্য নিয়ামত। মাদারুল মহাম মুহাম্মদ আমীন খাঁর অনুরোধক্রমে গ্রন্থকর্তা আল্লামা ফকীরুল্লাহ মিশকাত শরীফের অনুকরণে এর পরিচ্ছদ ও অধ্যায়সমূহ সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাটনার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে এটি সংরক্ষিত।

৩৩. আল্লামা হুমায়দী মুহাম্মদ বিন আবি নসর আল কুরতুবী (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ) প্রণীত "আল-জামউ বায়নাস সাহীহাইন"। ওয়ালিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ খাতীব তাবরিযী স্বীয় মিশকাত শরীফের ভূমিকায় এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

৩৪. আল-হাকিম আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০২ হিঃ) কৃত 'আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়ন'। 'মুসতাদরাক' শব্দের অর্থ সম্পূরক ও পরিশিষ্ট। সুতরাং এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ত্রুটিসমূহের পরিপূরক ও পরিশিষ্ট হিসাবেই লিখিত। আল্লামা যাহবী ও আল্লামা ইবনুল মলকান এই 'মুসতাদরাক' গ্রন্থ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। হাকীম সুয়ুতী এই 'মুসতাদরাকে'র হাশিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। এর নাম "তাওশীহুল মুদরিক ফী তাসহীহিল মুসতাদরাক"।

৩৫. আবু আলী হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ আল গাস্‌সানী (মৃঃ ৪২৭ হিঃ) প্রণীত 'তাকঈমুল মুহমাল'। এটি দু'খণ্ডে পরিসমাপ্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের যে সমস্ত বর্ণনাকারীর নামে শাব্দিক ভ্রম-প্রমাদ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে তাদের নাম এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩৬. মোল্লা আলী ইবনু মুহাম্মদ সুলতান আল ক্বারী আল হারাবী সুম্মাল মাক্কী (মৃঃ ১০১০ হিঃ) প্রণীত 'শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী'। এতে সহীহ বুখারীর শুধু ঐ সমস্ত হাদীসের ব্যাখ্যা রয়েছে যেগুলোর সনদ সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত মাত্র তিনটি। সহীহ বুখারীর মধ্যে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা **মাত্র ২২টি**। তন্মধ্যে অধিকাংশই মাক্কী ইবনু ইবরাহীমের মধ্যবর্তিতায় বর্ণিত হয়েছে। তিনিই ইমাম বুখারীর প্রথম স্তরের শাইখ (শিক্ষক) ছিলেন। সুতরাং তিনি তাবিঈগণ সাহাবীদের পরবর্তী স্তরের মুসলিম থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ আল মোহেব্বী তাঁর 'খুলাসাতুল মা' আসির' নামক গ্রন্থে এই সুলাসিয়াতিল বুখারীর কথা উল্লেখ করেছেন।[1]

---

১. বিস্তারিতের জন্য দেখুন ঃ মওলানা আবদুস সালাম মুবারকপুরী (মওঃ উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর পিতা) কৃত 'সীরাতে বুখারী' এবং মওঃ মুহাম্মদ হুসাইন রাসুদেবপুরী কৃত 'ইমাম বুখারী' পৃঃ ১২১।

৩৭. মওলভী রাযীউদ্দীন আবুল খায়ের আবদুল মজীদ খান টংকী প্রণীত 'মু' আল্লিমুল ক্বারী শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী'। এটি ১৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়ে ১২৬১ হিজরীতে আগ্রার মুফীদে আম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব বাহাদুর ভূপালী (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ-১৮৯০ খ্রীঃ) সুলাসিয়াতে সহীহ বুখারীর একখানা অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী উর্দু অনুবাদ করেন। এই উর্দু তরজমার নাম 'গুনিয়াতুল ক্বারী'।

৩৮. মওলানা মুহাম্মদ শাহ ইবনু আলহাজ্জ হাসান (মৃঃ ৯৩৯ হিঃ) কৃত 'শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী'। অনুরূপভাবে আল্লামা আবু তাইয়িব শামসুল হক ডয়ানবী আযিমাবাদীও (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ-১৯১১ খ্রীঃ) 'সুলাসিয়াতে বুখারী'র বেশ চমৎকার ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। এর নাম 'ফাযলুল বারী শারহু সুলাসিয়াতিল বুখারী'। দুঃখের বিষয় এটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

৩৯. 'আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আশশামী আশ্‌শাফিই' সংকলিত 'দুরারুদ্দুরারী ফী শারহি রুবা ইয়াতিল বুখারী'। সহীহ বুখারীর যে সমস্ত হাদীসের সনদ সূত্র চারজন রাবী বা বর্ণনাকারীর মধ্যবর্তিতায় আঁ হযরত (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে, শুধু সেই সব হাদীসকে চয়ন করে নিয়ে এই সুন্দর ভাষ্যগ্রন্থখানি সংকলন করা হয়েছে। ভাষ্যকার আল্লামা আহমদ আশ্-শাম এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে 'জারকাশ,' 'আত্-তানকাহ,' 'কিরমান' প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এর মূল্য ও মান-মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন। অধিকন্তু নিজের ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি 'কুলতু' আমি বলি বাক্যাংশ ব্যবহার করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তুলেছেন।

৪০. শাইখ আবদুল বাসেত ইবনু মওলভী রুস্তম আলী ইবনু মোল্লা আসগর আলী (মৃঃ ১২২৩ হিঃ- ১৮০৮ খ্রীঃ) কৃত "নাযমুল লাআল ফী শারহি সুলাসিয়াতিল বুখারী"। ভূপালের নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খাঁ (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ-১৮৯০ খ্রীঃ) কৃত ইত্তেহাফুন্নুবালায় এ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১]

Also see : India's contribution to Hadith Literature by Dr. Md. Ishaq.

১. ইত্তেহাফুন্নুবালা ঃ ১৬১ পৃঃ মওলানা ইমাম খাঁ নোশহরবী কৃত "হিন্দুস্থান মেঁউলুমে হাদীস" শীর্ষক প্রবন্ধ, আজমগড় থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মা 'আরিফ' ৫ম সংখ্যা ; ৫৬শ বর্ষ পৃঃ ২৩৯ ; মওলানা রিয়াযউদ্দিন ইসলাহী কৃত 'তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন' ১ম খণ্ড ঃ পৃঃ ২২১ ঃ আরও দেখুন ঃ শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসীন দেহলভী (মৃঃ ১০৫০ হিঃ) কৃত 'আখবারুল আখ্‌য়ার'।

ইফাবা ২০০৩-২০০৪/প্র১৫০২(উ) ৫,২৫০
ইফাবা প্রকাশনা ৮২/২